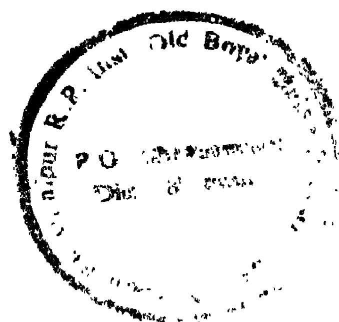
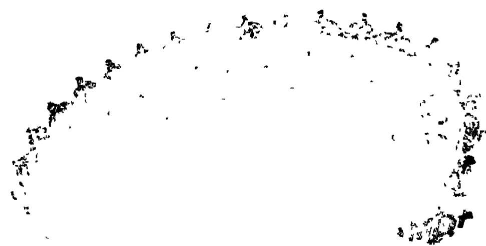
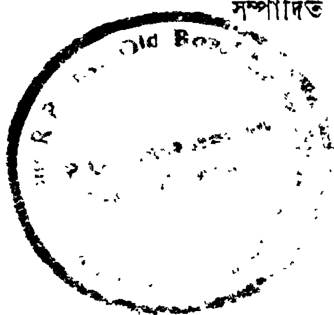


বাংলার বীর বন্দীরা



নিরঞ্জন সেন

সম্পাদিত



ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির
বঙ্গীয় রেড্-এড্ কমিটি

প্রকাশক
নিরঞ্জন সেন
বঙ্গীয় রেড্-এড্ কমিটির পক্ষে
১২১ লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা

প্রচ্ছদপট আঁকিয়াছেন : শিল্পী—অনিল ভট্টাচার্য্য

১লা অক্টোবর, ১৯৪৫

দাম—এক টাকা
[এই পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ সমস্ত অর্থ রেড্-এড্-ফাণ্ডে দেওয়া হইবে]

প্রাপ্তিস্থান :
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মুদ্রাকর
কিশোরী মোহন নন্দী
গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা, লেন
কলিকাতা

"বাংলার বীর বন্দীরা" বের হলো। এখানা "বাংলার বিস্মৃত বন্দীরা"র পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। আসলে বইখানা নূতন ক'রে লেখা হয়েছে বললেও কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হবে না। "বাংলার বিস্মৃত বন্দীরা" বের হওয়ার পরে দেশের সর্ব্বত্র বন্দীদের মুক্তির জন্যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, লম্বামেয়াদী বন্দীরা আজ আর বিস্মৃত নয়। সে-জন্যে এ-বই-এর নাম পরিবর্ত্তন করা হলো।

বন্দীদের মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু জোরালো আন্দোলন আজো শুরু হয়নি। তাঁদের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই আন্দোলন একদিনের জন্যেও বন্ধ করা উচিত নয়। শুধু তাই নয়, আন্দোলনের গাঢ়তা আরো বহুগুণ বাড়ানো আবশ্যক। তা না হ'লে আমরা তাঁদের মুক্ত করাতে পারব না।

বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে খাজা সার নাজিমুদ্দীন যখন ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে লম্বামেয়াদী বন্দীদের সাথে দেখা করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে টোকিওর পতন হলে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে। বাংলা সরকারকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে টোকিওর পতন হয়েছে।

১লা অক্টোবর, ১৯৪৫ — মুজফ্ফর আহ্মদ

এই পুস্তকে আছে ঃ



বন্দাবীর

[শিল্পী : প্রদোষ দাশগুপ্ত]



(১৯৪৫) সেপ্টেম্বর মাসের বিভিন্ন তারিখে মুক্ত দীর্ঘ মেয়াদী বন্দীদের সহিত বঙ্গীয় রেড-এড কমিটির সভাপতি মুজফ্‌ফর আহমদ ও সম্পাদক নিরঞ্জন সেন

ভূমিকা

আন্দামান থেকে রাজবন্দীদের ফিরিয়ে আনার জন্য ১৯৩৭ সালে যখন সারা দেশময় তুমুল আন্দোলন চলছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "বাংলা দেশ কখনও তার নির্ব্বাসিত সন্তানদের কথা ভুলতে পারবে না"।

সেই বন্দীদের মধ্যে এখনও অনেকে কারাবাস করছেন। দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায় থেকে তাঁদের শরীর ভেঙে পড়েছে, কিন্তু তাঁদের দেশভক্ত মন হল অপরাজেয়। জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ তাঁরা করেছিলেন; সেইজন্মভূমির সেবার জন্য তাঁরা আকুল হয়ে রয়েছেন। কিন্তু এখনও তাঁদের পচ্তে হচ্ছে জেলের প্রাচীরের পিছনে। বাংলা, কি ভারতবর্ষ, কখনও কি তাঁদের কথা ভুলতে পারে?

এঁদের কথা নিয়ে যে ভাবে দৃপ্ত জনমত গড়ে তোলা আমাদের কর্ত্তব্য, সে ভাবে কাজ আমরা হয়তো করতে পারি নি। মাঝে মাঝে তাই মনে হয়ে থাকতে পারে যে, আজ এঁদের কথা বুঝি দেশবাসী ভুলতে বসেছে। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে, এঁরা হলেন বাংলাদেশের গৌরব, এঁদের নিয়ে আমরা বাংলায় দেশপ্রেমের বড়াই করি; ফাঁসির মঞ্চে উঠে মুক্ত, দীপ্ত জাতীয় জীবনের জয়গান এঁরা আমাদের শুনিয়েছেন। দেশ কি কখনও এঁদের কথা প্রকৃতই ভুলে থাকতে পারে?

কারাপ্রাচীর এখনও দেশবাসীর কাছ থেকে এই মুক্তিসাধকদের সরিয়ে রেখেছে। আবার এঁদের ফিরিয়ে না আনা পর্য্যন্ত আমাদের শান্তি নেই।

১৯৩০ সালে গান্ধীজী যখন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন, তখনকার সেই মহিমামণ্ডিত দিনগুলির কথা কার না মনে গাঁথা হয়ে আছে? তখন বাংলার বীর সন্তানদের অসম সাহসের কথাও বা কে ভুলতে পেরেছে? কার না মনে পড়ে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের কথা? চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংবাদ কার না মনে প্রাণে শিহরণ জাগিয়েছিল? সন্ত্রাসবাদে-যে মুক্তি আসে না তা আমরা জানি, কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, জন-আন্দোলনের সোনার কাঠির

সন্ধান যখনও মেলে না, তখন সর্ব্বদেশেই দেশপ্রেমের প্রকাশ দেখা গেছে সন্ত্রাসবাদে। বাংলাদেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি বলে ১৯৩০ সালে নূতন করে সন্ত্রাসবাদের জোয়ার দেখা দিয়েছিল। সরকার তার জবাব দিয়েছিল প্রচণ্ড, নির্মম, অত্যাচারী, দমননীতি চালিয়ে। ভুল পথে চল্‌লেও যে বিপ্লবী বীরদের দিবারাত্রির স্বপ্ন ছিল দেশের মুক্তি, তাদের শাস্তি দেবার জন্য সব চেয়ে কড়া ব্যবস্থা বহাল হল। অ্যাণ্ডারসনি রাজত্বে পুলিশ জুলুম হামেশা চলতে লাগল, তাড়াহুড়ো করে বিশেষ কানুন কায়েম হল, পিটুনী পুলিশ চেপে বসল, "সান্ধ্য আইন" জারি করা হল, অর্ডিনান্স্ আর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বেড়াজালে শত শত যুবক আটক পড়ল। সরকারের কড়া হুকুম হল বন্দীদের শায়েস্তা করো, কয়েদ খানায় তাদের আলাদা বেখে সাজা দাও।

এই তরুণ বিদ্রোহীদের মধ্যে অনেকে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিলেন; আরো অনেককে আন্দামানের "জলজ্যান্ত নরকে" ও অন্যান্য কয়েদখানায় পাঠানো হল। বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে সাধারণ মানুষের নাগরিক অধিকার বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব রইল না। বাংলার বুকে জুলুমশাহী চেপে বস্‌ল; মার, পিট গালাগালি, খানাতল্লাস হল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। জেল কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহার প্রায়ই হতে লাগল অমানুষিক। বিশেষ করে আন্দামানে বন্দীদের হল প্রাণান্ত, আহার জঘন্য, পানীয়ের ব্যবস্থা কদর্য্য, সভ্যজীবন যাপনের সরঞ্জামের ছিল একান্ত অভাব। বাংলার অনেক জেলেও চাবুক মারা, ডাণ্ডাবেড়ী লাগানো, ঘানিকাঠে জুড়ে দেওয়া— এই ধরণের সাজা দেওয়া হল রাজবন্দীদের। অনশন ধর্ম্মঘট বার বার হতে লাগল। ১৯৩৩ সালে আন্দামানে অনশন ধর্ম্মঘটের ফলে তিনজন বন্দী, মোহিত, মোহন ও মহাবীর প্রাণ দিলেন। তাঁরা হলেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদ। ১৯৩৮ সালে ঢাকা জেলে অনশন ধর্ম্মঘটে হরেন্দ্র মুন্সির আত্মত্যাগের কথাও কেউ ভোলেনি। ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন মারা গেলেন, কারাগারে অস্বাভাবিক অবস্থায় কয়েকজন আবার উন্মাদরোগে আক্রান্ত হলেন। কিন্তু সরকারের টনক্ নড়ল না।

এত জোরজুলুম সইতে হলেও বন্দীরা স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ পথের অনলস সন্ধান থেকে বিরত হয়নি। অধিকাংশ সন্ত্রাসবাদী রাজবন্দী ছিলেন আন্দামানে। সেখানে

তাঁরা নিজেদের কর্মপদ্ধতির পর্য্যালোচনা করলেন, প্রকৃত বৈপ্লবিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে লাগলেন, বিভিন্ন দেশের গণ-আন্দোলন আর বিশেষ করে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের অপূর্ব্ব সাফল্য থেকে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করলেন। সন্ত্রাসবাদ-যে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুঞ্জীভূত নৈরাশ্যেরই দুঃসাহসিক প্রতিচ্ছবি তা বুঝতে শিখলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সন্ত্রাসবাদ যে ব্যাহত করবে তা জানলেন, সংহত গণ-আন্দোলনই যে মুক্তির একমাত্র পথ তা বুঝলেন। প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে অধিকাংশ মার্কস্‌বাদকে একমাত্র যথার্থ বিপ্লবী আদর্শ ও কার্য্যক্রম বলে মানলেন। সুদূর আন্দামানে "কমিউনিস্ট কন্‌সলিডেশন" নামে সংস্থার সৃষ্টি হল। যে কয়েদখানায় একসময় না ছিল কুঠুরীতে আলো, না ছিল লেখাপড়ার সরঞ্জাম, সেখানে যেন একটা "মার্কস্‌বাদী বিশ্ববিদ্যালয়ের" পত্তন হল। নূতন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যেন বন্দীদের চোখ খুলে দিয়ে মুক্তি পথের প্রকৃত সন্ধান দিল।

বন্দীশালা থেকে বিবৃতি প্রকাশ করে তাঁরা এই মত পরিবর্ত্তনের কথা জানালেন। গান্ধীজীর কাছে এ খবর পাঠালেন। সন্ত্রাসবাদের পথে স্বাধীনতা-যে আসবে না, এ কথা অকুণ্ঠ ভাষায় তাঁরা দেশবাসীকে জানালেন।

১৯৩৭ সালে যখন নূতন শাসনতন্ত্র স্থাপিত হল, আর কংগ্রেস যখন সাতটী প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করল, তখন সবার মনে আশা হল যে, নাগরিক অধিকার এবার বিস্তৃত হবে, আন্দামানের নরক থেকে রাজবন্দীদের ফিরিয়ে এনে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হবে, আর যাঁরা বিনাচারে আটক রয়েছেন তাঁদের তখনই খালাস দেওয়া হবে, কিন্তু সরকার কিছুতেই দেশবাসীর দাবীতে কান দিল না। তাই ১৯৩৭ সালের জুলাইমাসে আন্দামানে ২৩৪ জন রাজবন্দী অনশন ধর্ম্মঘট করলেন। বিদ্যুতের মত খবরটা সর্বত্র ছড়িয়ে গেল, ভারতবর্ষের বহু কারাগারে প্রায় একহাজার রাজবন্দী সঙ্গে সঙ্গে উপবাস করলেন। দেশ স্তম্ভিত হল, আকুল আগ্রহে দেশবাসী বন্দীমুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দেশময় যখন দারুণ উৎকণ্ঠা, তুমুল বিক্ষোভ, তখন গান্ধীজী অবিচলিত থাকতে পারলেন না। তিনি আন্দামানে তার পাঠালেন, বললেন যে তিনি বন্দীদের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকবেন। অনশন ধর্ম্মঘট স্থগিত রাখতে তাঁদের অনুরোধ

জানালেন। সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে বন্দীদের যথার্থ ধারণা কি, তা তিনি জানাতে চাইলেন। বন্দীরা গান্ধীজীর কাছে একটা যুক্তিপূর্ণ বিবৃতি পাঠিয়ে জানালেন যে, তাঁদের মতে সন্ত্রাসবাদ কেবল যে ভুল তা নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদ ক্ষতিগ্রস্তই করে। গান্ধীজী আশ্বাস দিলেন যে তাঁদের মুক্তির জন্য তিনি আন্দোলন চালাবেন। তাঁরই উপদেশে পঁয়ত্রিশ দিন পরে অনশন ধর্ম্মঘট স্থগিত হল।

আন্দোলনের প্রথম ফল পাওয়া গেল ১৯৩৮ সালে।* আন্দামান থেকে রাজবন্দীরা দেশে ফিরলেন। গান্ধীজী আলিপুর আর দমদম জেলে তাঁদের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁরা যে সন্ত্রাসবাদের পথ সম্পূর্ণ পরিহার করেছেন সেই বিষয়ে তাঁর সকল সন্দেহ দূর হল। বাংলার লাটের সঙ্গে গান্ধীজী দেখা করলেন, আর কলকাতা থেকে যাবার আগে জানিয়ে গেলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে সকল রাজবন্দী মুক্তি পাবে, এ ধরণের আশ্বাস তিনি সরকারের কাছে পেয়েছেন।

একবৎসর কেটে গেল কিন্তু সরকারের ধনুকভাঙা পণের কোন নড় চড়ের লক্ষণ দেখা গেল না। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে আলিপুর আর দমদম জেলে আবার অনশন ধর্ম্মঘট শুরু হল। ব্যাকুল হয়ে গান্ধীজী তাঁদের অনুরোধ করলেন উপবাস থেকে বিরত হতে, আর তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য নিজের সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইকে পাঠালেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তিনজন সদস্য—রাজেন্দ্র প্রসাদ, বিধান রায় আর প্রফুল্ল ঘোষ—জেলে তাঁদের সঙ্গে দেখা করলেন। বিনা শর্তে তাঁদের মুক্তি ঘটাবার জন্য সারা দেশে আন্দোলন চালাবার প্রস্তাব বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে গৃহীত হল। ধর্ম্মঘট যখন আটাশ দিন ধরে চলেছে, তখন কমিটির তরফ থেকে শরৎ বসু, সুভাষ বসু, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, রবি সেন, মুজফ্ফর আহ্মদ আর সোমনাথ লাহিড়ী তাঁদের অনুরোধ করলেন যে দেশবাসীর কাছে তাঁদের জীবন হল অমূল্য, সুতরাং তাঁদের মুক্তির জন্য আন্দোলন যখন চালানো হচ্ছে তখন যেন তাঁরা অনশন ধর্ম্মঘট বন্ধ করেন। এ অবস্থায় আবার তাঁরা উপবাস স্থগিত রাখলেন।

ইতিমধ্যে জনমতের চাপে বাংলার সরকার একটা চালাকীর আশ্রয় নিল। একটা "পরামর্শ দাতা কমিটি" খাড়া করা হল, আর এ কমিটির কাজ হল রাজবন্দীদের সম্বন্ধে বিচার করে খালাস সম্বন্ধে সুপারিশ করা। কমিটি বললো

যে ১৪৫ জনকে বিনাশর্ত্তে মুক্তি দেওয়া চলে। এঁদের মধ্যে মাত্র তিনজন ছিলেন দীর্ঘ মেয়াদে বন্দী, আর প্রায় সকলেরই খালাস পাওয়ার সময় হয়ে এসেছিল। চল্লিশ জনকে শর্ত্তাধীন অবস্থায় মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ এল ; এঁদের দণ্ডকাল পূর্ণ হতে তখনও তিন থেকে পাঁচ বৎসর বাকী ছিল। যে পঁয়ত্রিশ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে কমিটি কোন সুপারিশ করেনি।

এই কমিটি দীর্ঘ মেয়াদী যে তিনজনের মুক্তি সুপারিশ করে, তাঁরা সকলেই দুরারোগ্য রোগে ভুগছিলেন। ঐ তিনজনের মধ্যে একজন হলেন অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ; কিন্তু সুপারিশ সত্ত্বেও সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়নি, আজও তিনি কারাবাস করছেন। একাদিক্রমে পনেরো বৎসরেরও বেশী তিনি জেলে রয়েছেন ; চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার তিনি ছিলেন একজন প্রধান আসামী। তাঁর জীবনকথা সত্যই আমাদের কাছে একটা গৌরব-কাহিনীর মত। স্বদেশীযুগে, ১৯০৭ সালে, কিশোর বয়সে তাঁর মুক্তি সংগ্রামে "হাতে খড়ি" হয়। তার পর থেকে আটাশ বৎসর তিনি ইংরেজের জেলে কাটিয়েছেন। আসামের চা-বাগান কুলীদের সংগ্রামে তিনি নেতৃত্ব করেছেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের পাশে দাঁড়িয়ে। আসাম-বাংলা রেল শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটে তিনি একজন পরিচালক ছিলেন। বাংলা কংগ্রেসের তিনি ছিলেন একজন নেতা, বহুবার তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন। কংগ্রেস আন্দোলনে বারবার কারাবরণ করেছেন। ৫৬ বৎসর বয়সে আজ তিনি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েছেন ; বহুমূত্র, দৃষ্টিহীনতা, যক্ষা, অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ প্রভৃতি বহু ব্যাধি তাঁকে জর্জ্জর করে রেখেছে। সরকারের কিন্তু হুঁশ ফেরে নি, "পরামর্শদাতা কমিটির" সুপারিশ সত্ত্বেও বাংলার এই বীর সন্তান আজও কারারুদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন।

কমিটি যে চল্লিশ জনকে শর্ত্তাধীন অবস্থায় মুক্তি দেবার সুপারিশ করে, তাঁরা স্বভাবতই ঐ শর্ত্তগুলি অগ্রাহ্য করেন। তাই আজও তাঁরা কারাগারে রয়েছেন। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলা সরকারের মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীন বলেন যে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর যাঁরা দণ্ডিত, তাঁদের ১৪-বৎসর মেয়াদ পূর্ণ হলে মুক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করা হবে। হয়তো "বিবেচনা" সরকারী মহারথীরা করেছেন, কিন্তু মুক্তির ব্যবস্থা হয় নি। অতি তুচ্ছ এই প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদাও সরকার রাখে নি।

১৪ বৎসর পূর্ণ হলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত সাধারণ অপরাধীদেরও মুক্তি দেওয়া হয়। এটা ইংরেজেরই জেলের নিয়ম। কিন্তু দেশভক্তেরা হলেন সরকারের চক্ষুশূল, তাই তাঁদের বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। বরিশালের রমেশ চট্টোপাধ্যায়, আর চট্টগ্রামের কালী চক্রবর্ত্তী ও হরিপদ ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত অল্পবয়স্ক বলে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দেওয়া হয়। এঁদের মধ্যে অতি সম্প্রতি আইনত বিশবৎসর কারাভোগের পর রমেশ চট্টোপাধ্যায় মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু ১৮।১৯ বৎসর পার হয়ে গেলেও আর দুজনকে এখনও ছাড়া হয় নি। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত আটত্রিশ জনের মধ্যে অন্তত একুশজন ১৪ বৎসরেরও বেশী আটক রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয় নি। এই তেজস্বী দেশভক্তদের কাছে বাঙালী কত আশা করে রয়েছে, এঁদের জ্বলন্ত দেশ-প্রেমের আগুনে বাংলার সকল দৈন্য সকল মালিন্য শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন; ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থায় দেশের গৌরব এই রাজবন্দীরা কারাগারে কালাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছেন।

শর্ত্তাধীনে যাঁদের ছাড়ার কথা হয়েছিল, তাঁরা প্রায় সকলেরই মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর মুক্তি দেওয়ার একটা অভিনয় দেখানো হল। মুক্তি পেয়ে তাঁবা বেরিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু জেলের দেউড়ীতে তাঁদের আটকানো হল। "ভারতরক্ষা" আইনের বেড়াজালে বেঁধে তাদের অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করা হল! যে আটাশ জনকে এভাবে কয়েদখানায় ফেরৎ পাঠানো হল তাঁরা সকলেই তার আগে বহু বৎসর জেলে কাটিয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকজনের নাম করা যায়; বরিশালের শচীন করগুপ্ত জেলে ১৫ বৎসর, আর ময়মনসিংহের নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ১৪ বৎসর ছিলেন। কিন্তু সরকারী হিসাবে তখনও তাঁদের শায়েস্তা করা যায় নি!

বাংলা সরকার যথেষ্ট ভালোভাবেই জানে যে এই রাজবন্দীরা সন্ত্রাসবাদ একেবারে বর্জ্জন করেছেন। সরকার জানে যে এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কার্য্যক্রম সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চীন ও স্পেনকে সাহায্য করা সম্পর্কে এই রাজবন্দীরা তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওয়াহর লাল নেহরুর কাছে যে পত্র ও সংগৃহীত অর্থ প্রেরণ করেন সে কথাও সরকার জানে। ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে ঢাকা জেল থেকে

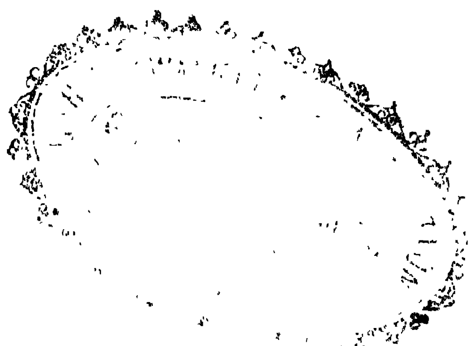
এই বন্দীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন যে বিবৃতি পাঠান, ফ্যাশিস্ট বিরোধী সংগ্রামে বিশ্বব্যাপী জন-আন্দোলনের সঙ্গে হাত মিলাবার জন্য দেশবাসীর কাছে যে আহ্বান তাঁরা জানান, সে বিবৃতির কথা সকলেই জানে। নির্লজ্জ সরকার নিজেদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য ঐ বিবৃতি "ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট" মারফৎ প্রচার করতে কসুর করে নি। কিন্তু যাদের ঐ বিবৃতি, তাঁদের মুক্তি দেওয়ার সুবুদ্ধি সরকারের ঘটে নি।

আমলাতন্ত্রের স্পর্দ্ধার জবাব দেশবাসীকে দিতে হবে। অনন্ত সিংহ, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, সুনীল চ্যাটার্জ্জী, প্রভাত চক্রবর্ত্তী, নলিনী দাস, মোক্ষদা চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি হলেন আমাদের দেশের গৌরব, আমাদের জাতির মুকুটমণি। মুক্তি সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ সৈনিক হলেন তাঁরা। তাঁদের কর্ম্ম ও জীবনের কাহিনী এই বইয়ে বর্ণিত হয়েছে। দেশ সেবার জন্য আকুল আগ্রহ নিয়ে তাঁরা শৃঙ্খলিত অবস্থায় অপেক্ষা করছেন। দীর্ঘ ক্লেশ ভোগের ফলে শরীর তাঁদের বিকল হতে চলেছে। কিন্তু অদম্য অপরাজেয় তাঁদের চিত্তবল। বাংলার আজ আর দুঃখকষ্টের সীমা নেই। পরাধীনতার গ্লানি আমাদের অসহ্য, দুর্ভিক্ষ মহামারীর প্রকোপে আমরা মুহ্যমান্, বেদনা ও নৈরাশ্যের পঙ্কিল আবর্ত্তে আমাদের দুর্দ্দশার অন্ত নেই। আজ তাই আমরা ফিরে চাইছি সেই বীর দেশভক্তের দলকে, যারা একদিন বাংলার ভাঙা বুকে নূতন স্পন্দন, নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন। যাদের গৌরব কাহিনী হল আমাদের গর্ব্ব, দেশবাসীর মনে যাঁরা অজর অমর হয়ে থাকবেন, তাঁরা আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন, বাংলার ব্যর্থ প্রাণের আবর্জ্জনা পুড়িয়ে ফেলে দেশপ্রেমের আগুন তাঁরা জ্বালুন।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ — হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



চুঁচুড়া ময়দানে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবীতে বিরাট সভার একাংশ



চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও অন্যান্য "সন্ত্রাসবাদী" ঘটনা কাহিনী এখনো বাঙ্গালীর নিকট অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস। এই সমস্ত কাহিনীর প্রধান প্রধান নায়ক সেই ১৯৩০ সাল হইতে এই ১৯৪৫ পর্য্যন্ত এখনো কারাগারে যাবজ্জীবন দীপান্তর বা দীর্ঘ মেয়াদে দণ্ডিত বন্দী।

দীর্ঘ কারাজীবন তাঁহাদের বৃথা যায় নাই। প্রগতিবাদী আন্দোলনের ঢেউ কারাপ্রাচীর ভেদ করিয়াও তাঁহাদের মনকে যে দোলা দেয়, তাহার ফলে অধিকাংশ 'সন্ত্রাসবাদী' বন্দী কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। গান্ধীজী ও দেশবাসীর নিকট একাধিকবার তাঁহারা ঘোষণা করেন যে, সন্ত্রাসবাদের মৃত্যু হইয়াছে, উহা অতীতের বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। সে হিসাবে তাঁহাদের তখনকার কর্ম্ম-পদ্ধতিও আজ অতীতের বস্তু—শুধু সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতিতে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি কার্য্যকলাপকে আজ আর কেহ স্বাধীনতা অর্জ্জনের উপায় বলিয়া মনে করে না। কিন্তু সেই অতীত কর্ম্মকাণ্ডের ভিতর ভ্রান্তি আর যাই থাক—স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা ও আত্মত্যাগের যে গৌরব উহাকে উজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহা চিরদিনই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা

১৯৩০ সালের কথা। সমস্ত ভারতবর্ষে এক নূতন গণ জাগরণের ঢেউ। বাংলার যুবকদের মনে, ছাত্র আন্দোলনে সর্ব্বত্রই এক নূতন স্পন্দনের আভাষ। সাইমন কমিশন বয়কট, কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব ও বিভিন্ন প্রদেশে শ্রমিক আন্দোলনের ফলে জাতীয় কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য অহিংস সংগ্রামের নির্দ্দেশ দেয়। এপ্রিল মাসে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। বাংলা দেশেও লবণ আইন অমান্য, হরতাল, ধর্ম্মঘট, ১৪৪ ধারা অমান্য ব্যাপক আকার ধারণ করে।

কিন্তু বাংলার যুব সম্প্রদায় সশস্ত্র বিদ্রোহের যে রোমাঞ্চকর স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছিল, কিছুদিন হইতে তাঁহারা তাহা বাস্তবে পরিণত করিতে আয়োজন করেন। এই প্রচেষ্টার ব্যাপক আত্মপ্রকাশ হয় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে।

১৭ই এপ্রিল চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেস কমিটিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে জিলা কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি শ্রীযুত অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক শ্রীযুত সূর্য্য সেন, কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীযুত নির্ম্মল সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রভৃতি ১৯শে এপ্রিল ১৪৪ ধারা অমান্য করিবেন। সমস্ত সহরে উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা —নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হইবেন।

কিন্তু ঘটনা ঘটিয়া গেল অন্যরূপ। ১৮ই এপ্রিল রাত্রিতে চট্টগ্রাম সহরের প্রধান পুলিস অস্ত্রাগার এবং অক্সিলিয়ারী ফোর্সে'স অফ ইণ্ডিয়ার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের অস্ত্রাগার একই সময়ে বিপ্লবীদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়—টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন আফিসে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। সহর হইতে যথাক্রমে ৪৫ ও ৭৫ মাইল দূরে দুইটি স্থানে রেল লাইন নষ্ট করিয়া এবং টেলিগ্রাফ তার কাটিয়া সহরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলার চেষ্টাও হইয়াছিল। অক্সিলিয়ারী ফোর্সের অস্ত্রাগার দখল করিয়া বিপ্লবীরা অনেক রাইফেল, পিস্তল ও লুইসগান হস্তগত করে এবং অস্ত্রাগারের দালানে আগুন ধরাইয়া দেয়। ঐ সময়ে দুইজন রক্ষী, একজন সার্জ্জেণ্ট মেজর এবং অন্যান্য আরও চারিজন লোক নিহত হয়। পুলিস লাইনেও বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার দখল করিয়া বন্দুক, রিভলবার ও গোলাগুলি হস্তগত করে। একজন সান্ত্রী নিহত হয় এবং দালানে আগুন লাগাইয়া

দেওয়া হয়। বিপ্লবীরা সংখ্যায় প্রায় ৬০ জন ছিলেন। তাঁহাদের নেতা শ্রীযুত সূর্য্য সেন (মাষ্টারদা), অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, নির্ম্মল সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রভৃতির নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এবং পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ইঁহাদের প্রত্যেকের নামে প্রথমে ৫০০০৲ পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল কিন্তু পরে সূর্য্য সেনের নামে উহা বাড়াইয়া ১০০০০৲ টাকা এবং গণেশ ঘোষের ও অনন্ত সিংহের নামে ৬০০০৲ করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া আরও অনেকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। বিপ্লবীরা আত্মগোপন করিয়া জিলায় ও প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়েন।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরের দিন পেট্রোলের আগুনে দগ্ধ মুমূর্ষু হিমাংশু সেন নামে একটি ছাত্র তাঁহার বন্ধু সুখেন্দু দস্তিদারের সহিত গ্রেপ্তার হইয়া পরে হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। ২০শে এপ্রিল সহরের মধ্যে ফিরিঙ্গি বাজার অঞ্চলে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশ গ্রহণকারী অমরেন্দ্র নন্দী নামে একটি যুবক একটি মিলিটারী পার্টির সহিত সংঘর্ষে নিহত হন।

২২শে এপ্রিল বিপ্লবীদের প্রধান দলের সহিত সরকারী সৈন্যদলের সহরের উপকণ্ঠে জালালাবাদ নামক পাহাড়ে এক খণ্ডযুদ্ধ হয়। দুই পক্ষেই হতাহত হয়। বিপ্লবীদের ১২ জন নিহত হন। আহতদের মধ্যে শ্রীযুত অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার সংগাহীন অবস্থায় ধৃত হইয়া পরে প্রাণত্যাগ করেন। সেই রাত্রিতে ফেণী রেলওয়ে ষ্টেসনে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে পলাতক বিপ্লবী সন্দেহে ৪ জন যুবক গ্রেপ্তার হন। থানায় লইয়া যাওয়ার পথে তাঁহারা হঠাৎ পুলিসের বিরুদ্ধে গুলী চালাইয়া পলাইয়া যায়। পরে প্রকাশিত হয় যে ঐ ৪ জনের নাম অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল (মাখন) এবং আনন্দ গুপ্ত।

ইহার কিছুদিন পরে ৬ই মে কালারপোল নামক একটি গ্রামে পলাতক ৬ জন যুবককে ধরার জন্য পুলিস তাহাদের ধাওয়া করে—দুই পক্ষের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। ফলে শ্রীযুত দেবপ্রসাদ গুপ্ত, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন ও স্বদেশ রায় নামে ৪ জন বিপ্লবী নিহত হন এবং সুবোধ চৌধুরী ও ফণী নন্দী নামে দুইজন ধরা পড়েন। শ্রীযুক্ত ফণী নন্দী পরে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা সম্পর্কে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডভোগের সময়ে আন্দামানে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯৩৭ সালে আলীপুর জেলে মারা যান।

কয়েকমাসের মধ্যেই যাঁহারা এই মামলা সম্পর্কে ধৃত হন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করে বলিয়া খবর বাহির হয়। এই অবস্থা রোধ করিতে শ্রীযুত অনন্ত সিংহ কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশের কেন্দ্রীয় অফিসে যাইয়া আত্মসমর্পণ করেন—সমস্ত বাংলাদেশে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দেখা যায় যে, তাঁহার এই আত্মসমর্পণের কিছুদিনের মধ্যেই যাঁহারা স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন তাঁহারা তাহা প্রত্যাহার করিয়া লন।

এদিকে পুলিশ খবর পায় যে চট্টগ্রাম লুণ্ঠনের কয়েকজন ফেরারী বিপ্লবী ফরাসী চন্দননগরে একটি বাড়ীতে আছে। ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের অধীনে এক সশস্ত্র বাহিনী ঐ বাড়ী ঘেরাও করে—দুই পক্ষে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলে। শ্রীযুত জীবন ঘোষাল (মাখন) সৈন্যদলের গুলিতে নিহত এবং আনন্দ গুপ্ত আহত হন। শ্রীযুত গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্ত ধৃত হন।

কিছুদিনের মধ্যেই চট্টগ্রামের এক গ্রাম হইতে শ্রীযুত অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ধরা পড়েন।

১৯৩২ সালের ১৩ই জুন ধলঘাট নামক গ্রামে একটি বাড়ী মিলিটারী সৈন্যেরা ঘেরাও করে। দুই পক্ষে গুলি চলে। বিপ্লবীদের গুলিতে সৈন্যদলের নায়ক ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ নিহত হন এবং বিপ্লবীদের মধ্যে শ্রীযুত নির্ম্মল সেন ও অপূর্ব্ব সেনও নিহত হন।

১৯৩৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পুলিস সৈন্যদলের সাহায্যে গৈরালা নামক স্থানে শ্রীযুত সূর্য্য সেন ধরা পড়েন এবং মে মাসে গহিরা নামক স্থানে তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত ধৃত হন।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে যাঁহারা ধৃত হইয়াছিলেন তিন দফায় স্পেশাল ট্রাইবিউনালের সাহায্যে তাঁহাদের বিচার হয়।

প্রথম দফায় ৩০ জনের বিরুদ্ধে হত্যা, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির অভিযোগে বিচার হয়। প্রায় দেড় বৎসর পরে ১৯৩২ সালের ১লা মার্চ্চ অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রভৃতি ১২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং শ্রীযুত অনন্ত সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত নন্দ সিংহের ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় দফায় শ্রীযুত অম্বিকা চক্রবর্ত্তীকে ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের দায়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল কিন্তু পরে হাইকোর্টে আপীলে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

তৃতীয় দফায় শ্রীযুত সূর্য্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও শ্রীযুতা কল্পনা দত্তকে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া প্রথমোক্ত দুইজনকে প্রাণদণ্ড এবং স্ত্রীলোক বিবেচনায় শ্রীযুতা কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হয়।

এইভাবে যে ১৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ৩ জন অল্প বয়স বিবেচনায় ১৯৩৭ সালে মুক্তি পান। ফণী নন্দী যক্ষ্মারোগে আলীপুর জেলে ১৯৩৭ সালে প্রাণত্যাগ করেন। আন্দামান প্রত্যাগত বন্দীদের মুক্তির জন্য গান্ধীজী ১৯৩৭—৩৮ সালে যে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার ফলে শ্রীযুতা কল্পনা দত্ত ঐ সময়ে মুক্তি পান।

মরণাপন্ন অসুখের জন্য ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীযুত আনন্দ গুপ্ত জেল হইতে মুক্তি পাইয়া এখন অন্তরীণ আছেন। বাকী ৮ জন এখনও মুক্তি পান নাই।

বীর বন্দীদের জীবন কাহিনী

অম্বিকা চক্রবর্ত্তী

অম্বিকা চক্রবর্ত্তী—চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে আজও এ নাম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে উচ্চারিত হয়। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এই অগ্নি পুজারী বীর যোদ্ধার কীর্ত্তিগাথা অমর হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

আজ তিনি ৫৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ। তাঁহার জীবনের দীর্ঘ ২৭ বৎসর কাটিয়াছে সাম্রাজ্যবাদীদের কোন না কোন কারাগার বা বন্দীশালায়। গত ১৫ বৎসর যাবৎ তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিযোগে দণ্ডিত হইয়া জেলে দণ্ডভোগ করিতেছেন।

এই বীর যোদ্ধার জন্ম হয় চট্টগ্রামের এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁহার পিতা পণ্ডিত নন্দকুমার শিরোমণি চট্টল হিতসাধনী সভার একজন নেতা ছিলেন।

১৯০৫ সালে ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক অম্বিকা দেশ সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁহার পিতার স্বদেশ প্রেম ও জনসেবার আদর্শ তাঁহাকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ঐ ছোট বয়সেই স্বদেশী মেলা সংগঠন ও বিদেশী বর্জ্জন প্রভৃতি জনসেবার কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আগাইয়া যাইয়া কাজ করিতে উৎসাহ দিতেন। শরীর চর্চ্চায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

১৯০৫-৭ সালের আন্দোলন বাংলায় এক স্বদেশ প্রেমের জোয়ার আনিয়া দেয়—আমলাতন্ত্র সন্ত্রস্ত হইয়া দমন নীতির আশ্রয় নিল। চট্টল হিতসাধনী সভা অবৈধ প্রতিষ্ঠান ঘোষিত হইল। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে পুলিশ তাহা জোর করিয়া দাবাইয়া দেয়—অম্বিকা পুলিশের হাতে আহত হন। তাঁহার লাঞ্ছিত জীবনের আরম্ভ এই রূপ।

শাসক শক্তির হাতে নিগ্রহ ভোগ তাঁহার কিশোর মনকে দৃঢ় করিয়া তুলিতে সাহায্য করে। জাতীয় অবমাননা ও অসহায় অবস্থা তাঁহার চোখ খুলিয়া দেয়। ঐ সময়ে তিনি এবং তাঁহার ৪ জন বন্ধু একত্রিত হইয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে লাইব্রেরী ও ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটি হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ১৯০৭ সালে তিনি বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন।

ইহা খুবই স্বাভাবিক যে তিনি শীঘ্রই জাতীয় কংগ্রেসের কাজে আকৃষ্ট হইবেন। ১৯০৭ সালের বড়দিনের সময় সুরাটে জাতীয় কংগ্রেসের যে ঐতিহাসিক অধিবেশন হইয়াছিল তিনি তাহাতে বামপন্থী ডেলিগেট হিসাবে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ তাঁহার কাকা পছন্দ করিতেন না। সুরাট হইতে ফিরিবার পর ঐ কাকা তাঁহাকে শাসন করিয়া স্বদেশীর পথ হইতে ফিরাইবার জন্য এমন বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন যে ফলে তাঁহার কঠিন অসুখ হয়। অসুখ সম্পূর্ণ ভাল হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে জীবনে তিনি আর ঐ বাড়ীতে ফিরিবেন না—দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করিবেন।

১৯১০ সালে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের পিতা যাত্রামোহন সেন অম্বিকাকে নিজের সঙ্গে লইয়া ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে যান। ১৯১১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইয়াছিল চট্টগ্রামে—অম্বিকা ও তাঁহার

সহকর্ম্মীরা ছিলেন তাহার প্রাণ স্বরূপ। ঐ সময়ে একটি ঘটনার ফলে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। কনফারেন্সে আসার জন্য ১০।১২ জন লোক নৌকায় কর্ণফুলী নদী অতিক্রম করার সময়ে নৌকা ডুবি হয়। খবর পাইয়া অম্বিকা ঘটনাস্থলে যাইয়া দেখেন, কর্ণফুলীর সে এক ভীষণ রূপ। তিনি নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন নৌকায় লোকগুলির জীবন রক্ষার জন্য। একাই তাঁহাদের উদ্ধার করেন। সর্ব্বজন বরেণ্য নেতা সুরেন্দ্র নাথ তখন কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অম্বিকার এই অদ্ভূত সাহস ও আত্মত্যাগের কাহিনীতে মুগ্ধ হইয়া সমবেত জনতার সামনে তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া সম্মানিত করেন এবং নিজের মূল্যবান পকেট ঘড়িটি তাঁহাকে পুরস্কার হিসাবে উপহার দিয়াছিলেন।

দুর্গত দেশবাসীর সেবাই ছিল তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র। জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিত। ১৯১১-১২ সালের কথা। .চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদ নামে একটি গ্রামের মুসলমান পল্লীতে আগুন লাগিয়া যায়। একটি ঘরে একটি ছোট্ট মেয়ে আটকা পড়ে তাহাকে রক্ষা করার কোন উপায়ই ছিলনা। অম্বিকা একটি ভিজে কাঁথা জড়াইয়া জলন্ত ঘর হইতে মেয়েটিকে উদ্ধার করিয়া আনেন। মানব দরদী অম্বিকার জীবন এইরূপ বহু ঘটনায় ভরা। তাই চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে অম্বিকা ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা আজ উপকথার নায়কের মত লোকের মুখে মুখে।

১৯১৩ সালে তিনি দামোদর বন্যা প্রপীড়িতদের সেবায় ঝাঁপাইয়া পড়েন। সেখানে তিনি বাংলার বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ নেতা যতীন মুখার্জ্জী—"বাঘা যতীনের" সংস্পর্শে আসেন। ঐ সময়ে যতীন মুখার্জ্জী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সে বিপ্লবে কি উপকার হবে—যদি না তার ফলে জনগণের কোন লাভ হয়?"

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮ সাল) সময়ে বিদেশ হইতে বিশেষ করিয়া জার্ম্মেনী হইতে অস্ত্র আমদানী করিয়া সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে পরিকল্পনা বাংলার বিপ্লবীরা করিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই। সে পরিকল্পনার নায়ক মৃত্যুজয়ী যতীন মুখার্জ্জী ৩ জন সহকর্ম্মীর সহিত বালেশ্বরের সশস্ত্র সৈন্য বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। অন্যান্য অনেকে ধরা পড়িয়া গেলেন। শ্রীযুক্ত অম্বিকাও ছিলেন তাঁহাদের একজন। ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি জেলে তিন আইনের বন্দী ছিলেন।

ঐ বৎসর মুক্ত হইয়াই তিনি পুনরায় কংগ্রেসের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২১ সালে তিনি চাঁদপুরে চা-বাগানের কুলীদের দাবী নিয়া দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের প্রসিদ্ধ মজুর ধর্ম্মঘটের একজন অগ্রণী নেতা হন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। এই সময় হইতে তিনি বাংলা কংগ্রেসের একজন প্রসিদ্ধ নেতা। তিনি চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি, বি, পি, সি, সি, ও এ, আই, সি, সি'র সভ্য হন।

তাঁহার চরিত্রবল ও স্তায় নিষ্ঠার খ্যাতি এত প্রবল ছিল যে, চট্টগ্রামের কোন এক জমিদার মৃত্যু শয্যায় তাঁহার নাবালক পুত্রের অভিভাবকত্ব ও জমিদারী দেখার ভার শ্রীযুত অম্বিকার হাতে সমর্পণ করেন। অনুরোধ করেন যে, তাঁহার ছেলে সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি যেন তাহাকে দেখা শুনা করেন। ১৯২১ সালে কংগ্রেস কর্তৃক বৃটিশ আইন-আদালত বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার ফলে চট্টগ্রামে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত গণ-আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুত অম্বিকা ঐ রূপ একটি আদালতের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

বৃটিশ কারাগারের বাহিরে এককালীন বেশী দিন থাকার সৌভাগ্য তাঁহার ছিল না। তবুও যখনই তিনি বাহিরে ছিলেন তখন কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে যোগ দেওয়া বাদ পড়ে নাই। তিনি ১৯২২ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত গয়া কংগ্রেস এবং ১৯২৩ সালে দিল্লীতে কংগ্রেসের স্পেশাল অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বাংলা দেশে আবার বিপ্লবী কার্য্যকলাপ দেখা দেয়। ফলে শ্রীযুত অম্বিকা ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আহত অবস্থায় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হন এবং ১৯২৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত আর্ডিন্সান্স আইনের বন্দী হিসাবে আটক থাকেন।

১৯২৮ সালে মুক্ত হইয়াই তিনি কলিকাতায় ও ১৯২৯ সালে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশনে বাংলার ডেলিগেট হিসাবে যোগ দেন। ১৯২৯ সালে তিনি বন্দবিলা সত্যাগ্রহের সময়ে বি, পি, সি, সি কর্ত্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন। এই সময়ে তিনি সাংবাদিক হিসাবে কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন। বাংলা কংগ্রেসের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অংশের মধ্যে মিলন ঘটাইবার যে মহৎ প্রয়াস ঐ সময় হইয়াছিল শ্রীযুত অম্বিকা তাহার উদ্‌যোগী ছিলেন।

কিছুদিন পরেই ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় তিনি ধৃত হন। ঐ সম্পর্কে স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু পরে হাইকোর্টে উহা মকুব করা হয় এবং তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে তাঁহার প্রায় ১৬ বছর কাটিয়া গিয়াছে। টি-বি, এপেণ্ডিসাইটিস, বহুমূত্র, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি কঠিন রোগে তিনি আজ জর্জ্জরিত। ১৯৩৯ সালে বাংলা সরকার নিযুক্ত বন্দীমুক্তি পরামর্শদাতা কমিটিও তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনায় একমত হইয়া বিনাশর্ত্তে তাঁহার মুক্তির সুপারিস করিয়াছিল। কিন্তু আজও তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই।

তিনি সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন, কমিউনিষ্ট মতবাদ পোষণ করেন। তাঁহার ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী মতবাদ দেশবাসীর কাছে সুপরিচিত। জেল হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিবৃতি ও আবেদন মারফত এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মত জানাইয়াছেন।

শতরোগ জর্জ্জরিত এই বীর নেতার স্বাস্থ্য বহুদিন হয় দীর্ঘ কারাবাসের ফলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু অটল মন ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া তিনি সেই দিনের আশায় রহিয়াছেন, যে-দিন তিনি তাঁহার আরব্ধ কাজ সমাধা করিবার সুযোগ ফিরিয়া পাইবেন। তাঁহার জীবন কাহিনী, তাঁহার আত্মত্যাগ, তাঁহার জনসেবার ইতিহাস আমাদের জাতীয় জীবনে অমর গৌরবের কাহিনী হইয়া থাকিবে।

অনন্ত সিং

কল্পনা দত্তের লেখা অনন্ত সিংএর একটি ক্ষুদ্র জীবনী ৯ই আগষ্টের 'জনযুদ্ধে' প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এখানে তাহাই তুলিয়া দিলাম:

তখন আমি খুব ছোট। বিখ্যাত ব্যায়ামবীর রামমূর্ত্তি চাটগাঁয় এসেছেন সার্কাস দেখাতে। মানুষের বুকের ওপর দিয়ে হাতী চ'লে যায়, মানুষ চলন্ত মোটরের গতিরোধ করে—এই শুনে শহরশুদ্ধ লোক সার্কাসের তাঁবুতে ভেঙে পড়ে। এই দলেরই এক সাহেব মোটরের সঙ্গে বাঁধা লোহার মোটা শিকল ছিঁড়ে ফেলতে পারত। সে চাটগাঁবাসীকে চ্যালেঞ্জ ক'রে বলে, 'পারে কেউ তোমাদের মধ্যে

এভাবে শিকল ছিঁড়তে ?' এক যুবক এগিয়ে গিয়ে সেই শিকল ছিঁড়ে ফেল্‌ল। সে যুবক অনন্ত সিং। লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়ল অনন্তসিংয়ের বীরত্বের কথা। চাটগাঁর মান রেখেছে অনন্ত সিং। সেই প্রথম আমি অনন্তদার নাম শুনি।

তারপর থেকে অনন্ত সিং হ'লেন চাটগাঁর বীরত্বের প্রতীক। অনন্ত সিং শুধু লোহার শিকলই ভাঙে না, দাসত্বের শৃঙ্খল চূর্ণ করা তার জীবনের ব্রত।

১৯২২। চট্টগ্রামে এক রেলওয়ে ডাকাতিতে ১৭ হাজার টাকা লুট হ'ল। স্বদেশী ডাকাতি। লোকে ব'লল, এর পেছনে আছে অনন্ত সিং। শহরের কাছেই বহদ্দার হাটে বোমা তৈরী ক'রতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে স্বদেশী দলের দারুণ সংঘর্ষ। একজন ইন্সপেক্টর খুন হ'ল। এমনি আরো কত ঘটনার সঙ্গে অনন্ত সিংয়ের নাম জড়িত হ'য়ে আছে। অনন্ত সিং সব্যসাচীর মত দুহাতে গুলি ছুঁড়তে পারে, গুণ্ডাবদ্‌মায়েশরা অনন্ত সিংকে যমের মত ভয় করে। চাটগাঁর আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে অনন্তদা হ'লেন রূপকথার নায়ক।

১৯২৫ কিংবা ১৯২৬ সালে অনন্তদা, গণেশদা (গণেশ ঘোষ), এবং আরও কয়েকজন রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব'লে আটক হন। ছাড়া পাবার পর অনন্তদার নেতৃত্বে জায়গায় জায়গায় ব্যায়ামচর্চ্চার আখড়া গ'ড়ে উঠল। সদরঘাটের ক্লাবটি অনন্তদা নিজে চালাচ্ছেন। আদর্শ বিপ্লবী হ'তে হ'লে ভাল স্বাস্থ্য চাই। অনন্তদার নেতৃত্বে ছেলেরা ঘোড়ায় চড়া, ছোরা, লাঠি খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ শিখছে। অনন্তদা খুব ভাল বন্দুক ছুড়তে পারতেন। অব্যর্থ টিপ ছিল তাঁর। ছেলেদের মাথায় ফল রেখে সেই ফল তিনি বিনা দ্বিধায় বিঁধতে পারতেন। ক্লাবের ছেলেদের নিয়ে অনন্তদা মাঝে মাঝে শহরের বাইরে বেড়াতে যেতেন। সেখানে হ'ত তাদের বন্দুক চালানোর হাতে খড়ি। মাষ্টারদা (সূর্য্য সেন—অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় যাঁর ফাঁসি হয়েছিল।—জঃ সঃ) ব'লতেন, অনন্ত'র তৈরী প্রত্যেকটি ছেলে একেকটি রত্ন—অনন্তরই একেকটি প্রতিচ্ছবি। এই সমস্ত ছেলেরা ছিল শহরের সব থেকে সেরা ছেলে—ইস্কুলকলেজের সব থেকে ভাল ছেলে।

অনন্তদা জানতেন, অন্যকে কাজে অনুপ্রাণিত ক'রতে হ'লে নিজে কাজ ক'রে দেখিয়ে দিতে হয়। একথা তিনি প্রায়ই ব'লতেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জন্যে ১৫ হাজার টাকা তোলার নির্দ্দেশ দলের ছেলেদের দেওয়া হ'ল। সকলের

আগে অনন্তদা দিলেন ৩ হাজার টাকা। অনন্তদার বাবা টাকার সিন্দুক খুলে বসেছেন। অনন্তদা সেখান থেকে ৩ হাজার টাকার থলেটি তুলে নিয়ে ব'ললেন, 'বাবা, আমার অংশ নিয়ে চললাম।'

অনন্তদার দলের ছেলেরা জনসাধারণের প্রত্যেকটা কাজে সকলের আগে এসে দাঁড়াত। সভায়, সম্মেলনে, উৎসবে, মেলায় আর ধর্ম্মানুষ্ঠানে তারাই স্বেচ্ছাসেবক। ১৯২৯ সালে চাটগাঁয় এক সম্মেলন উপলক্ষে মেয়েদের সভা বসেছে। একদল গুণ্ডা হঠাৎ ইটপাটকেল ছুঁড়ে মেয়েদের আক্রমণ করছে, খবর পেয়ে অনন্ত সিং নিজে সেই গুণ্ডার দলকে একটা বাড়ী থেকে টেনে বার ক'রে তাদের শাস্তি বিধান করেন। জনসাধারণের আপদে বিপদে, দুর্গতদের সেবায় অনন্তদার দল প্রাণ তুচ্ছ ক'রে ছুটে যেত।

দলের ছেলেদের ওপর অনন্তদার ভালবাসা ছিল অসীম। একটি ঘটনা আজও মনে আছে। ১৯৩০ সালের ৩১শে মার্চ্চ—অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ১৮ দিন আগে। অনন্ত সিংয়ের বাড়ীতে বোমা তৈরী হচ্ছে। তৈরী ক'রছেন আর দেখিয়ে দিচ্ছেন তারকেশ্বর দস্তিদার। দুটি বিস্ফোরক পদার্থ মেশাবার সময় হঠাৎ অসাবধানতার ফলে বোমা ফেটে যায়। বিস্ফোরণের আগুনে তারকেশ্বর দস্তিদারের বুক ও মুখ একেবারে পুড়ে যায়। আরো দু'একজন আহত হয়। একে দিনের বেলা, তার ওপর প্রচণ্ড শব্দ। যে কোন মুহূর্ত্তে পুলিশ এসে প'ড়তে পারে। কাজেই তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে স'রে পড়া দরকার। অথচ তারকেশ্বর দস্তিদারকে তখন সে অবস্থায় ফেলে রেখে চ'লে যাওয়া যায় না, নিয়ে যাবারও অবস্থা নয়। তারকেশ্বর দস্তিদার অনন্তদাকে অনুরোধ ক'রলেন, 'আমাকে মেরে ফেলে তোমরা তাড়াতাড়ি চ'লে যাও, নইলে সবশুদ্ধ বিপদে প'ড়বে।' অনন্তদার চোখে জল। ব'ললেন 'আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, তোমাকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রব। প্রাণ নেওয়া আমার কাজ নয়, বাঁচানোই আমার কাজ।' অন্য সকলকে ঘর থেকে জিনিষপত্র সরাবার কথা ব'লে অনন্তদা নিজের মোটরে ক'রে মরণাপন্ন তারকেশ্বর দস্তিদারকে নিয়ে সারাদিন শহরের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে এক সমর্থক ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়ে তারকেশ্বর দস্তিদারের চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল। তারকেশ্বর দস্তিদার সেবাযত্নে বেঁচে উঠলেন।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের কথা বাংলাদেশের কে না জানে? সেদিন একদল যুবক চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছিল, পুলিশ লাইন তারা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। টেলিগ্রাফ অফিস চুরমার ক'রে রেললাইন উপ্‌ড়ে ফেলেছিল। লোকে আজও সেই দুঃসাহসী বিদ্রোহকে অনন্ত সিংয়ের কীর্ত্তি ব'লে স্মরণ করে। মাষ্টারদা একদিন আমাকে বলেছিলেন, '১৯২৭ সালে অনন্ত যখন অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও তার আনুষঙ্গিক কতকগুলো কাজের পরিকল্পনা দেয়, তখন সেটাকে আমরা অবাস্তব স্বপ্ন ব'লে উড়িয়ে দিই। সে স্বপ্ন অনন্ত সফল করেছে।'

অনন্তদা তাঁর সহকর্মীদের যেমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, তেমনি তাদের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি জানতেন, তাঁর মুখের কথায় তারা প্রাণ দিতে পারে। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অব্যবহিত পরে দলের অল্পবয়স্ক ছেলেরা যখন পুলিশের ছলচাতুরী বুঝতে না পেরে স্বীকারোক্তি ক'রে ফেলে, তখন অনন্ত সিং কলকাতায় পুলিশের কাছে ধরা দিলেন। ধরা দেবার আগে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এক চিঠিতে তিনি লেখেন,..."আমি আত্মসমর্পণ করছি ব্যক্তিগত কারণে। ভেবোনা আমার আশ্রয়ের স্থানাভাব ঘটেছে বা আমি অনুতপ্ত। আমি অনুতপ্ত নই বা আশ্রয়ের অভাবও আমার নেই। শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও আমার আশ্রয়ের অভাব হবে না।..."

অনন্তদার আত্মসমর্পণে শুধু পুলিশই নয়, আমরাও অবাক হয়েছিলাম। পরে তার ফলাফল স্পষ্ট হ'ল, যারা যারা স্বীকারোক্তি দিয়েছিল, তারা সবাই তখন স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার ক'রল। যারা স্বীকারোক্তি করেছিল, অন্যদের থেকে তাদের আলাদা রাখা হয়েছিল। অনন্তদা জেলে আসার পর যখন তাঁর সামনে দিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তারা কেঁদে ফেলল। সকলেই তাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার ক'রল। আদালতে একজনও রাজসাক্ষী পাওয়া গেল না। সরকারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

জেলখানার সাধারণ কয়েদী থেকে আরম্ভ ক'রে সেপাইদের ওপর পর্য্যন্ত অনন্তদার ছিল অসম্ভব প্রভাব। এমন কি, বড় বড় রাজকর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত অনন্তদাকে শ্রদ্ধা করত। চট্টগ্রাম পুলিশের একজন বড় সাহেব আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'অনন্ত সিংকে আমি শ্রদ্ধা করি। এমন ছেলে আমি কখনও দেখি নি।'

অনন্তদার সঙ্গে আমার আগে কখনও দেখা হয় নি। অনন্তদা জেলে আসার পর তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। অনন্তদা মেয়েদের দলে নেবার ঘোরতর বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি মেয়েদের বিশ্বাস করতেন না। এমন কি, যে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রত, তাকেও তিনি অবিশ্বাস করতেন। ব'লতেন, 'একজনকে বরং অবিশ্বাস ক'রে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি, কিন্তু অহেতুক বিশ্বাস ক'রে আমি আমার সংগঠনকে নষ্ট ক'রতে পারি না।' জেলে আসার পর অনন্তদা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অনন্তদার বিশ্বাস অর্জ্জন করতে পারা আমার জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা।

অনন্তদা তখন জেলে। চাটগাঁ শহরের বিভিন্ন জায়গায়, কাছারী পাহাড়ে জেলের চারিধারে ডিনামাইটের তার বসানো হয়েছে। জেলের ভেতরে ও বাইরে একই সঙ্গে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন সম্পূর্ণ। শেষ মুহূর্ত্তের সামান্য অসাবধানতায় ডিনামাইট ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

মামলার শুনানী শুরু হ'য়েছে, কাছারীর রাস্তায় প্রতিদিন শহরশুদ্ধ লোক ভিড় ক'রে দাঁড়ায়। চোখেমুখে তাদের উৎকণ্ঠা। ডকে সাক্ষীসাবুদকে জেরা করেন অনন্তদা নিজে। অভিজ্ঞ আইনজীবীরাও তাঁর ক্ষুরধার যুক্তিতর্ক দেখে বিস্ময় বোধ করে। স্থানীয় দৈনিক 'পাঞ্চজন্য' লেখে 'সিংহের········ জেরা।' কাগজ দেখতে দেখতে নিঃশেষ হয়।

যেদিন রায় বেরোবে, সেদিন রাস্তার মোড়ে সৈন্য মোতায়েন হয়েছে। চাটগাঁ কলেজে কেমিষ্ট্রী ক্লাসে আমরা প্রফেসরের জন্যে অপেক্ষা করছি। কোন যুবকের সেদিন ঘর থেকে বেরোবার হুকুম নেই। খুব কাছাকাছি বাড়ী থেকে দু'একটি ছেলে মাত্র কলেজে এসেছে। ঘণ্টাখানেক পরে প্রফেসর এলেন। ব'ললেন, রায় বেরিয়েছে। আমার বুক তখন দুরদুর করছে। ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চোখেমুখে তাদের দারুণ উৎকণ্ঠা। প্রফেসর হাসিমুখে ব'ললেন, 'কারও ফাঁসি হয় নি—অনন্ত সিংয়েরও নয়।' আনন্দে কেউ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে নি। রাস্তায় সমস্ত লোকের মুখে এক কথা, 'অনন্ত সিংয়ের ফাঁসি হয় নি।' বাড়ী আসতেই ঠাকুমা বললেন, 'রোজ আমি শিবের মাথায় বেলপাতা দিই—অনন্ত সিংয়ের যেন ফাঁসি না হয়। শিব আমার প্রাণের কথা শুনেছে।'

অনন্তদার কথা অসংখ্য লোকের কাছ থেকে ছাড়াও মাষ্টারদার মুখ থেকে শুনেছি। অনন্তদাকে আরও ভাল ক'রে জেনেছি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে। অনন্তদার অনুভূতি ছিল অত্যন্ত প্রখর, কথাবার্তার মধ্যে কোন রকম বাঁকাচোরা থাকতো না। গভীর অনুভূতি থাকলে ভাষার জন্য ভাবতে না, একথা তাঁর লেখা প'ড়েই প্রথম বুঝেছিলাম।

অনন্তদা ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। যা ধারণা করতেন, সোজাসুজি ব'লতে বাধতো না তাঁর। কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পারলে সহজে তা মেনে নিতে কখনও কুণ্ঠা বোধ করতেন না। অনন্তদার সঙ্গে পরিচয়ের বহুদিন পর তিনি খবর পাঠিয়েছিলেন, মেয়েদের সম্বন্ধে যে ধারণা এতদিন আমি পোষণ ক'রে এসেছি, সে ধারণা আমার ভুল। তারা যেন আমায় ক্ষমা করে।

মাষ্টারদার কাছে শুনেছি, অনন্তদা জীবনে ব্যর্থতা কাকে বলে জানেন না। যে কাজ যখন হাতে নিয়েছেন, সে কাজ শেষ না ক'রে ছাড়েন নি। তাই আন্দামানের বন্দীরা সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতার কথা চিন্তা করতে গিয়ে যখন কমিউনিষ্ট নীতিতে বিশ্বাসী হ'য়ে পড়ল, তখনও অনন্তদা ও তাঁর দলের ছেলেরা কমিউনিজমের প্রতি আস্থাবান হন নি। ব্যর্থতা তাঁরা কখনও দেখেন নি। তাঁদের জীবনে তাঁরা দেখেছেন শুধু সাফল্য, আর দেখেছেন জনসাধারণের সমর্থন ও অদ্ভুত ভালবাসা। তাই বিগত জীবনের অধ্যায়টুকুকে তাঁরা 'ভুল হয়েছে' ব'লে সহজে মুছে দিতে পারেন নি। যখন তাঁরা কমিউনিজমে বিশ্বাসী হলেন, তখন তাঁরা তার দ্বিধাহীন একনিষ্ঠ সেবক। সারা দুনিয়ার সামনে সন্ত্রাসবাদের প্রতি অনাস্থা ঘোষণায় তখন তাঁরা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নি।

দুর্ভিক্ষে ছিন্নভিন্ন, দুর্নীতিতে রাহুগ্রস্ত চট্টগ্রাম আজ অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ আর তাঁদের সহকর্ম্মীদের জন্য প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হ'য়ে আছে। চট্টগ্রাম আর সে চট্টগ্রাম নেই। দুবছরের সঙ্কট চট্টগ্রামের সমস্ত ঐতিহ্য ধুয়ে মুছে নিঃশেষ ক'রে দিয়েছে। জাপানী বোমার আশঙ্কায় কারাগারে থেকে চট্টগ্রামের বীর বন্দীদের উদাত্ত আহ্বান তারা শুনেছিল। সরকার তবু সেই বন্দীদের মুক্ত করে নি। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশবাসীর সেবা করতে চেয়েছিল তারা, সরকার সে দাবী উপেক্ষা রেছে। চট্টগ্রামের সহস্র সহস্র মানুষ সরকারী ঔদাসীন্যে প্রাণ দিয়েছে।

সে চট্টগ্রাম আর নেই। যে চট্টগ্রামে আগে অনন্ত সিংয়ের বীরত্ব কাহিনী মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ক'রত, সেখানে চলেছে চোর বদ্‌মায়েশের অবাধ রাজত্ব। বীরের দেশ আজ কাপুরুষতায় ছেয়ে গেছে। যে চট্টগ্রামের মা-বোনেরা দেশভক্ত ছেলেদের মুক্তির জন্তে একদিন শিবের মাথায় বেলপাতা দিত সেখানে আজ অসহায় মেয়ের দল নিজেদের দেহ তুলে দিচ্ছে মিলিটারী আর কণ্ট্রাক্টরের হাতে।

একদিন চট্টগ্রামের যুবকেরা ছিল চরিত্রের দিক থেকে সকলের শ্রদ্ধেয়। আজ এমন অসংখ্য যুবক আছে, বেশ্যার দালালি যাদের পেশা, মদ আর মেয়েতে যারা আসক্ত। দেশভক্তিকে তারা বিদ্রূপ করে। তাদের হতভাগ্য মা-বাপ চোখের জল ফেলে তাদের অভিসম্পাত করে।

গ্রামে গেলে এখনও শোনা যায় বৃদ্ধ চাষী কেউ কেউ জিজ্ঞেস করছে, ব'লতে পারো অনন্ত সিং কবে আসবে ? তারা জানে, অনন্ত সিংয়ের সামনে গুণ্ডা বদ্‌মায়েশ আর কণ্ট্রাক্টর, চোরাকারবারী আর মজুতদার কেউ টি'কবে না। তারা জানে, অনন্ত সিং এবার তাদেরই মধ্যে ফিরে আসবে। এবার জনগণের ঐক্য হবে তার আগ্নেয়াস্ত্র। তারা ভাবে, অনন্ত সিং এলে আবার তাদের সুদিন ফিরে আসবে।

গণেশ ঘোষ

গণেশ ঘোষের বাড়ী যশোহর জেলার বিনোদপুর। তিনি চট্টগ্রামে অল্প বয়সেই বিপ্লবী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে আমলাতন্ত্রের প্রচণ্ড নিপীড়নের ফলে চট্টগ্রামে বিপ্লবী আন্দোলন পরিস্ফুট ও বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ১৯২১ সালে জাতীয় কংগ্রেস যখন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের পন্থা হিসাবে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করে, তখন চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল সর্ব্বতোভাবে সেই আন্দোলনে যোগ দেয়। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল বেশ পুষ্ট ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। গণেশও এই সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২১ সালে চট্টগ্রামে কংগ্রেসের নেতৃত্বে দুইটি বেশ বড় বড় শ্রমিক ধর্ম্মঘট সংঘটিত হয়।

প্রথমটি বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর কারখানায় এবং দ্বিতীয়টি আসাম বেঙ্গল রেল কোম্পানীতে। অন্যান্যদের সহিত গণেশও এই দুইটি ধর্ম্মঘটের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। প্রথমটির পরিণতি হয় শ্রমিকদের সম্পূর্ণ জয়ে, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে ধর্ম্মঘটীরা সম্পূর্ণ জয়লাভে সক্ষম হয় নাই।

১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে যখন কংগ্রেসের আন্দোলন স্থগিত হইয়া যায়, তখন দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল তাহার প্রতিক্রিয়া চট্টগ্রামের যুব-সমাজকেও চঞ্চল করিয়া তোলে কিন্তু বিক্ষুব্ধ হইলেও চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুবকেরা হতাশ হন নাই ; তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন বিপ্লবী সংগ্রামের পথেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলন অব্যাহত রাখিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইয়া যাইবেন। ইহার ফলে ১৯২২ সাল হইতে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে কয়েকটি বিপ্লবী ঘটনা সংঘটিত হয়। এই সময় কমরেড গণেশ বিভিন্ন ঘটনার সংস্পর্শে চট্টগ্রামে ও কলিকাতায় বহুবার গ্রেপ্তার হন।

১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে গণেশ ঘোষ তিন আইনে গ্রেপ্তার হইয়া 'আলীপুর জেলে বন্দী হন। তারপর বাংলা এবং বাংলার বাইরে বিভিন্ন জেলে পূর্ণ চারি বৎসর কারাভোগের পর ১৯২৮ সালের শেষ ভাগে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পরই গণেশ চট্টগ্রাম হইতে প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া কলিকাতায় কংগ্রেস এবং যুব সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদান করেন।

এই সময়ে চট্টগ্রামে জাতীয় আন্দোলন সেরূপ দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুবকদের অপরিসীম প্রচেষ্টার ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চট্টগ্রাম জেলায় কংগ্রেসের প্রভাব ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করে ; চট্টগ্রামের ছাত্র সম্প্রদায় এবং যুব শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠে। যুবকদের শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে ব্যায়াম সমিতি ও যুব সমিতি গড়িয়া উঠে। গণেশ ঘোষ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য, জেলা যুব-সমিতির সম্পাদক, চট্টগ্রাম জেলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কলেজ এবং স্কুল সমূহের স্পোর্টস এসোসিয়েসনের সম্পাদক এবং চট্টগ্রামের বিখ্যাত সদরঘাট ক্লাবের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। বিপ্লবী যুবকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জাতীয়

কংগ্রেসের এবং জাতীয় মুক্তির বাণী চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছায়। কয়েক মাসের মধ্যেই চট্টগ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলন অপ্রত্যাশিত রূপে শক্তিশালী হইয়া উঠে। চট্টগ্রামে পুনরায় ১৯২১ সালের ঐতিহ্য ফিরিয়া আসে।

১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিবার ফলে সারা দেশব্যাপী এক অপূর্ব্ব প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়া উঠে। বিশ্বের দরবারে লাঞ্ছিত জাতির জীবনে লাহোর প্রস্তাব এক নূতন উদ্দীপনা আনিয়া দেয়। ভারতীয় জনগণ আশা আকাঙ্খায় উৎসাহিত হইয়া উঠে। চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুবকরা জাতীয় মহাসভার পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব বাস্তবে জাতীয় জীবনে রূপায়িত করিয়া তুলিবার কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

*　　*　　*　　*　　*　　*

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের যুবকেরা সরকারের অস্ত্রাগার সমূহ লুণ্ঠন এবং অধিকার করে। স্বল্প কালের জন্য হইলেও বিপ্লবী যুবকেরা চট্টগ্রাম নগরীতে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে।

তারপর ২২শে এপ্রিল তারিখে চট্টগ্রাম সহরোপকণ্ঠে জালালাবাদ পাহাড়ে যুদ্ধ। তারপর বহু খণ্ড যুদ্ধ।

চট্টগ্রামের বীর যুবকদের বুকের রক্তে স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সমগ্র দেশের আকাশ বাতাস মরনোন্মাদনায় ভরিয়া গেল। জাতীয় মুক্তির অসহ্য আবেগে ভারতের যুব সম্প্রদায় বিপ্লবী সংগ্রামের কঠোর বন্ধুর পথে দলে দলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

*　　*　　*　　*　　*　　*

গণেশ ঘোষ অন্য তিন জনের সহিত পুলিশের কঠোর এবং সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রে চন্দননগরে স্যার চার্লস টেগার্টের নেতৃত্বাধীন বৃটিশ সেনাদের সহিত খণ্ডযুদ্ধের পর ধৃত এবং বন্দী হন। বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দণ্ড হয়।

১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসের ১৫ই তারিখে প্রথম দলের সহিত তিনি আন্দামান নির্ব্বাসনে প্রেরিত হন।

তিনি কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিজেকে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির পরিচালনাধীন বলিয়া মনে করেন।

কি করিয়া তিনি কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি যাহা বলেন তাহার সারমর্ম এই :—

"অপ্রত্যাশিতভাবে, প্রায় সুনিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড এড়াইয়া যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ লইয়া যখন আন্দামানে আসি, তখন দীর্ঘ ভবিষ্যতের পানে যতদূর দৃষ্টি যায় তার সবখানির ভিতরই দেখা গেল দুর্ব্বিসহ কঠোর কারাজীবনের নিরবচ্ছিন্ন অপরিসীম দুঃখ লাঞ্ছনা। তাহার মধ্যে তখন এই কথাটাই খুব বড় হইয়া মনের ভিতর নাড়া দিয়াছিল যে, আমার সুদীর্ঘ কারাজীবনের প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে, জাতির সেবার জন্য নিজেকে যথোপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত ও উপযোগী করিয়া তোলা। অতীতের নিরলস কর্ম্মব্যস্ততার অবসান হইয়াছে। প্রতিদিনের অফুরন্ত সময় প্রবাহের মধ্যে নিজেকে নিরন্তর ব্যস্ত করিয়া রাখিবার উপযুক্ত কিছুই নাই। কল্পনার চক্ষে ভবিষ্যতের রূপ তখনও অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ, প্রায় অবয়বহীন। মনের চিন্তাধারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া অতীতের পানে চলিয়া যায়, অতীতের পর্য্যালোচনায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে। এই প্রশ্নটাই তখন বার বার মনে হইত : এতগুলি অমূল্য জীবনের চরম আত্মাহুতিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম কতটুকুই বা অগ্রসর হইয়াছে? ভারতের স্বাধীনতার পথ কতখানি উন্মুক্ত হইয়াছে? ভারতের উপর সাম্রাজ্যবাদের কঠোর নিষ্ঠুর মুষ্টি কতখানি শিথিল হইয়াছে? কংগ্রেসের পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলন যতই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিতে লাগিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শত শত বীর সন্ত্রাসবাদী যুবকদের নির্ব্বাসনে আন্দামানের কারাগৃহ যতই ভরিয়া উঠিতে লাগিল, ততই এই প্রশ্নটি আমার মনে উত্তরোত্তর প্রখর হইয়া উঠিয়া সমাধানের দাবী করিতে লাগিল। সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন তখন ভয়াবহ বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে। জাতীয় জীবনের মুক্তি আকাঙ্খা তখন সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে স্তব্ধ, মৌন, প্রায় অভিব্যক্তিহীন। ভারতের সমগ্র বুক জুড়িয়া সাম্রাজ্যবাদের যে আসন বিরাট বিশাল জগদ্দল পাথরের মত সারা জাতীয় জীবনের

শ্বাসরোধ করিয়া রাখিয়াছে, সমগ্র ভারতের শত সহস্র বীর বিপ্লবী যুবকের আত্মাহুতিতে, লক্ষ লক্ষ নরনারীর ত্যাগ ও দুঃখ বরণে সে কঠোরতা কমে নাই। চল্লিশ বর্ষব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলন ভারতের মুক্তি সংগ্রামে যথেষ্ঠ বেগ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা সাম্রাজ্যবাদকে কঠিন আঘাত হানিতে পারে নাই, তাহা ভারতের গণমুক্তির পথ প্রশস্ত করিতে পারে নাই।

"আমাদের অনুসৃত কর্ম্মপদ্ধতি যদি জনগণের স্বার্থের অনুকূলে হয়, আমাদের পথ যদি জাতীয় মুক্তির সুনিশ্চিত পথ হয়, তবে দেশের জনগণ তাহা গ্রহণ করে না কেন? ভারতের জনসাধারণ স্বাধীনতা চায়, তাহারা সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি কামনা করে। তথাপি তাহারা দলে দলে সন্ত্রাসবাদ গ্রহণ করে না কেন? স্বতঃই এই চিন্তা নিজেদের কর্ম্মপদ্ধতির বিশ্লেষণের উপর প্রশ্ন তুলিয়াছে বিপ্লবী পথ কি? বিপ্লবী আন্দোলন কি? বিপ্লব কি? ভারতীয় বিপ্লবের স্বরূপ কি প্রকার? একতাহীন বিভক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপ্লবীদলের পরিচালিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী কার্য্যের পথে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের সামর্থ্য কতখানি? জীবন-কৈশোর হইতে যে বিশ্বাস একান্ত নিষ্ঠায় অন্তরে পোষণ করিয়াছি, অহর্নিশি অনুশীলনে যে বিশ্বাস দেহের প্রতিটি রক্ত বিন্দুতে মিশিয়া রহিয়াছে, জীবনের প্রতিটি আকাঙ্খা, প্রতিটি কামনা, প্রতিটি উচ্ছ্বাস, প্রতিটি চিন্তা যে বিশ্বাসের সাথে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে, অফুরন্ত চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে আজ তাহাই একটি বিরাট প্রশ্নের আকার ধারণ করিয়া মনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"বাল্যকাল হইতে শিখিয়া শিখিয়া বুঝিয়াছি মুষ্টিমেয় দেশপ্রেমিক যুবকের অতুলনীয় বিক্রম এবং চরম আত্মত্যাগের ভিতর দিয়াই জাতীয় মুক্তির সিংহদ্বার রচিত হইয়া উঠে। কেহ গণ-বিপ্লবের কথা বলিলে উহা বিপ্লব-বিরোধিতা বলিয়া মনে করিতাম, মনে হইত উহা দুর্ব্বলতার নামান্তর। অহিংসা নীতির প্রগাঢ় প্রভাব কাটাইয়া প্রতিটি যুবককে বিপ্লবী পথে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান করিয়া তুলিতে যে শিক্ষা, যে আবেগ, যে অনুশীলন, চর্চ্চা ও সময়ের অপরিহার্য্য প্রয়োজন, নিজের কর্ম্মজীবনের সেই অভিজ্ঞতা হইতে তখন বুঝিতাম দেশের অগণিত অশিক্ষিত জনসাধারণকে ঠিক ওই ভাবে বিপ্লবের পথে সচেতন করিয়া তুলিতে, সুদুর অজানা ভবিষ্যতে সম্ভাব্য কেবলমাত্র একটি

আদর্শের জন্য উহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে, শুধু-যে বহু শতাব্দীর প্রয়োজন তাহাই নয়, উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই গণ-বিপ্লবের পথকে অবাস্তব, কল্পনাবিলাস, দুর্ব্বলতা এবং অ-বিপ্লবের পথ বলিয়া মনে করিতাম। অমার মনে হয় ১৯১৭ সালের রুশিয়ার জনগণের বিপ্লব ভারতের এবং বিশেষ করিয়া বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুব সমাজের উপর বিশেষ কোন, প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তখনকার দিনে ১৯১৬-১৭ সালের আয়র্লণ্ডের সিনফিন আন্দোলনের বীর বিপ্লবী যুবকদের কার্য্যপদ্ধতি, কল্পনাপ্রিয়, ভাবুক বাঙ্গালী যুবকদের মন অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করিয়াছিল। আমরা সেই আদর্শেই গড়িয়া উঠিয়াছিলাম। বিপ্লব পথের রূপ সম্পর্কে যে ধারণা এতদিন সুদৃঢ়ভাবে মনে প্রতিষ্ঠিত ছিল আজ যৌবনের পরিপূর্ণ চিন্তায় কঠোর বিশ্লেষণের সম্মুখে তাহা সংশয়ের ছায়ায় অস্বচ্ছ, ম্লান হইয়া উঠিল, তাহার মূল শিথিল হইয়া পড়িল।

"কিন্তু বিপ্লবের প্রকৃতি কি? প্রকৃত বিপ্লবের অভিব্যক্তি কিরূপ? জাতীয় জীবনে বিপ্লবের আগমনী কি ভাবে ধ্বনিয়া উঠে? প্রগতিমূলক বিপ্লব যদি একমাত্র জনগণ বাহিত পথেই আসে তাহা হইলে উহা কি রূপ পরিগ্রহ করে? জনবিপ্লবের সৃষ্টি রহস্য কি? জনবিপ্লবের পরিণতি কিসে? জাতীয় জীবনকে এই বিপ্লব কি ভাবে প্রভাবান্বিত করে?—এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর চাই। কিন্তু এগুলির জবাব দিবে কে?

"প্রকৃত বিপ্লবী পথের সন্ধানে আমার রাজনৈতিক জীবনে প্রথম রূপান্তরের সূচনা হইল। নির্ব্বাসিত সহযোগী কয়েকজন বন্দী বন্ধুর উপদেশ ও অনুরোধে মার্কস্-লেনিনের লেখা যে সামান্য কয়েকখানি বই আমাদের আন্দামানের কারাবাসের প্রথম দিকে ছিল, অনিচ্ছুক অথচ উৎকণ্ঠিত অধীর মনে আমি তাহা পড়িতে আরম্ভ করি।

"পূর্ব্বেকার নিঃসঙ্গ কারাবাসের দিনগুলিতে সোভিয়েট ও সাম্যবাদ বিরোধী কয়েকজন লেখকের কয়েকখানি বই হইতে সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে আমার কতকগুলি ভ্রান্ত ও অপ্রিয় ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল। বন্ধু বান্ধবদের সাথে অলোচনায় সমাজতন্ত্রবাদের যে বিষয়টি আমার কাছে বড় হইয়া

দেখা দিত তাহা হইতেছে উহার আন্তর্জাতিকতাবাদ। নিজের অপরিণত মনের স্বকল্পিত ধারণা দিয়া তখন বুঝিতাম সমাজতন্ত্রবাদীদের নিকট নিজেদের স্বদেশ একটি গৌণ বিষয় মাত্র; উহারা আপন জন্মভূমির স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সংগ্রাম করা অপেক্ষা অপর দেশের জনগণের বিভিন্ন অধিকারের জনা আন্দোলন করা অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে। তখন আমি ভাবিতাম পরাধীন ভারতের জনগণ আমরা, আমাদের পক্ষে নিজেদের স্বাধীনতার সংগ্রাম অপেক্ষা রুশিয়া, জার্ম্মাণী, ফরাসী, ইতালী, আমেরিকা এবং অত্যাচারী ইংলণ্ডের জনগণের অধিকারের জন্ত সংগ্রামের কথা চিন্তা করা শুধু অন্তায় নয়, এমন কি অসহনীয়।

"কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মার্ক্সের লেখা প্রথম কয়েকখানি বইএর মধ্যেই আইরিশ, পোলিশ, শ্লাভ প্রভৃতি জাতি সমূহের মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে মার্ক্সএর অতি শক্তিশালী সমর্থন ও সহানুভূতি দেখিয়া মার্ক্সবাদ সম্পর্কে আমি আগ্রহশীল হইয়া উঠি। উৎসাহিত হইয়া আমি মার্ক্সবাদ পড়িতে আরম্ভ করি। মার্ক্সবাদের মূলনীতিগুলির সহিত আমি যতই পরিচিত হইতে লাগিলাম ততই আমার মনের প্রথম প্রশ্নগুলি সম্পর্কে অল্প অল্প উত্তর পাইতে লাগিলাম। খুব অস্পষ্ট হইলেও আমি সামান্ত সামান্ত বুঝিতে পারিলাম যে জাতীয় স্বাধীনতার জন্ত জনগণের সংগ্রামের স্থান কখনও মুষ্টিমেয় কয়েকজন যুবকের সংগ্রাম গ্রহণ করিতে পারেনা,—তাহা যতই কঠোর, যতই প্রখর হউক না কেন। জনগণের মুক্তি জনগণের প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় সংগ্রাম ব্যতীত কখনও মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসবাদী যুবকের অপরিসীম শৌর্য্য প্রদর্শনে অথবা প্রাণের বিনিময়েও অর্জ্জন করা সম্ভব নয়। জনগণের মুক্তি একমাত্র জনসংগ্রামের পথেই আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে সমাজগতির অনিবার্য্য পথেই বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ আপন আপন শ্রেণী স্বার্থে সচেতন হইয়া উঠিয়া বিপ্লবী সংগ্রামের পথে আপনাদের সমস্ত সমস্তার সমাধান করিয়া লয়। সমাজ বিপ্লবের অব্যর্থ অমোঘ গতি পথের সম্মুখে বিপ্লবী চেতনাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য এই গতিকে ত্বরান্বিত করা, উহাদের বাধা বিঘ্ন অপসারণ করা, জনগণকে শ্রেণী স্বার্থে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা।

"মার্ক্সবাদের এই সাধারণ সূত্র গুলির সহিত পরিচিত হওয়ার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার বিপ্লব, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্যারী বিপ্লব প্রভৃতির

রূপ এবং গতি আমার নিকট সহজবোধ্য হইয়া উঠিল। আমার নূতন জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গী বিপ্লবের রহস্যপূর্ণ প্রহেলিকাময় দ্বারপথ ঈষদুন্মুক্ত করিয়া আমার নিকট সমাজ বিপ্লবের রহস্যোদ্ঘাটনের প্রকৃত পথের সন্ধান দেখাইয়া দিল। মার্ক্স বাদের প্রতি আমি অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম, মার্ক্সবাদের উপর আমার শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল।

"ভারতের স্বাধীনতা আমাদের স্বপ্ন, ভারতের মুক্তি আমাদের কামনা, স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য। সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হইতে ভারতের মুক্তি অর্জ্জন করিবার জন্যই আমরা জীবন পণ করিয়াছি। বাল্যকাল হইতে ইহাই আমাদের আদর্শ, ইহাই আমাদের ব্রত, ইহাই আমাদের লক্ষ্য। এই আদর্শের জন্যই বিপ্লবী যুবকেরা কোনরূপ ত্যাগ স্বীকারেই পরাঙ্মুখ নয়, এই আদর্শের জন্যই শত শত ভারতের বীর যুবক হাসি মুখে প্রাণ দান করিয়াছে। কিন্তু মনে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতে লাগিল স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ ও চরম লক্ষ্য কি? জার্ম্মেণী, ইটালী, ফ্রান্স, বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি স্বাধীন দেশ। তথাপি এই সমস্ত স্বাধীন দেশের জনগণ সামান্য আহার্য্য বৃদ্ধির আন্দোলনে ধর্ম্মঘট করিয়া সরকারের গুলির মুখে প্রাণ দেয় কেন? আমাদের দেশের জনগণের অবস্থা অপেক্ষা ইওরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের জনগণের অবস্থা প্রভূত পরিমাণে উন্নত হইলেও ওই সমস্ত দেশের জনগণের ভয়াবহ বেকার সমস্যা, অপরিসীম দুঃখ দুর্দ্দশা অনশন প্রভৃতি অভিযোগের কথা শোনা যায় কেন? ওই সমস্ত দেশের বিত্তশালী ধনিকেরা তাহাদের দেশের জনগণের উন্নততর, স্বচ্ছল ও সমৃদ্ধ জীবনের সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দুঃখ দুর্দ্দশার চির অন্ধকার আবর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে কেন? স্বাধীনতার অভাবই যদি আমাদের দেশের জনগণের সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশা অভাব অভিযোগের একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে ওই সমস্ত স্বাধীন দেশের জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশার সমাধান নাই কেন? যে স্বাধীনতা লাভের জন্য আমরা জীবন পণ করিয়া সংগ্রাম করিয়াছি, যাহার জন্য শহীদেরা জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, যে স্বাধীনতার জন্য ভারতের জনগণ উদ্বেলিত হৃদয়ে সংগ্রামরত, সাম্রাজ্যবাদের অবসানের পর সেই স্বাধীনতার রূপ কি হইবে? স্বাধীনতার যে সুস্পষ্ট ছবি অতি উজ্জ্বল ভাবে আমরা মনে মনে আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে সমস্তটা স্থান জুড়িয়া জনগণই ছিল

মুখ্য। সাধারণভাবে স্বাধীনতার অর্থ বুঝিতাম জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, জনগণের শোষণহীন স্বচ্ছল সমৃদ্ধ জীবন, সভ্য জীবনের অবদানে তাহাদের অবাধ ভোগাধিকার।

"কিন্তু ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের পথে এই আদর্শ লাভ সম্ভব নয়, সামান্য সংখ্যক বিপ্লবী যুবকের বিপ্লব আন্দোলনের পথেও ইহা সুদূর পরাহতই থাকিয়া যাইবে। বিপ্লব পথের প্রকৃত সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইবেই। একটি কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল কেবলমাত্র আকাঙ্খার তীব্রতার উপর অথবা দুঃখ সহিবার পরিমাণের উপর বা এমন কি প্রাণদানের সংখ্যা শক্তির উপর বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে না। বিপ্লবের সফলতা সুনিশ্চিত ভাবে নির্ভর করে নির্ভুল পথ অনুসরণের উপর, নির্ভুল কার্য্য পদ্ধতির উপর, নির্ভুল বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীর উপর, জাতীয় বিপ্লব পরিচালনার যথোপযুক্ত নেতৃত্বের উপর।

"তখন প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে: আমাদের আদর্শ লাভের প্রকৃত পথ কোন্‌টি? যে পথ নির্ভুল অভ্রান্ত ভাবে আমাদের লক্ষ্য পথে লইয়া যাইবে সেই পথের পরিচয় কি? জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা, জনগণের প্রকৃত মুক্তির সংজ্ঞা কি? আমাদের দুঃখ ভোগ কখনও বিফলে যাইবে না সত্য, দেশ প্রেমিক অগণিত শহীদের প্রাণদানে আমাদের মুক্তি সংগ্রাম গৌরবময় হইয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু যে সমস্যাসমূহ ব্যাপক আকার লইয়া আমার সমস্ত মন প্রাণ চঞ্চল অস্থির উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে তাহার উত্তর কি?

"মার্ক্সবাদী সাহিত্য হইতে এই সমস্যাগুলি সমাধানের ইঙ্গিত আমি পাইয়াছি। উত্তরোত্তর অধীর আগ্রহ লইয়া আমি মার্ক্সীয় সমাজ বিজ্ঞান, মার্ক্স, লেনিন, ষ্টালিন, প্রভৃতির লেখা পড়িতে লাগিলাম। অধিকতর শ্রদ্ধা লইয়া আমি কমিউনিষ্ট মতবাদ আলোচনা করিতে লাগিলাম। দিনের পর দিন যেন আমার প্রশ্নের উত্তর সমূহ আমার নিকট স্বচ্ছ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমি আমার পথের ইঙ্গিত পাইলাম।

"জনগণের যথার্থ মুক্তি, রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের যথার্থ অধিকার, জনগণের অভাবহীন স্বচ্ছল জীবন যাত্রা, জনগণের ভোগাচ্ছাদনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা, সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্নততর জীবন পথের সুযোগ গড়িয়া তোলা এবং সুনিশ্চিত করা

সম্ভব কেবল মাত্র জাতীয় সম্পদের উপর জনগণের যথার্থ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াই, ভোগাচ্ছাদনের উৎপাদন ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিয়াই। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমস্ত বিপ্লবেই ধনিক (বুর্জ্জোয়া) নেতারা জনগণের স্বচ্ছল জীবন যাত্রার সুযোগ সৃষ্টির ভিত্তিতেই বিপ্লবে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা এবং সমর্থন লাভ করিয়াছে, কিন্তু বিপ্লবের সফলতার পর কোথাও তাহারা এই কর্ম্ম সূচী কার্য্যে পরিণত করে নাই। কেবল মাত্র শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষেই উপর্য্যোক্ত কর্ম্ম পদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব। কারণ বর্ত্তমান সমাজে শ্রমিকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা শোষিত, উৎপীড়িত এবং সর্ব্বপ্রকারে নিপীড়িত। সমাজের সমস্ত সম্পদ ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর জনগণের স্বত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া সমস্ত প্রকার শোষণ ও উৎপীড়ন ব্যবস্থা চিরতরে বিলোপ সাধন করা কেবল মাত্র শ্রমিকদের স্বার্থের অনুকূলেই নয়, জনগণের মুক্তি ও শোষণহীন জীবন সুনিশ্চিত করিবার জন্যও ইহা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়। একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবের সফল পরিণতিতেই জনগণের প্রকৃত মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইবে।

"শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্কে পূর্ব্বে আমি খুব শ্রদ্ধা সম্পন্ন ছিলাম না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় একাগ্রমনে কামনা করিতাম ইংরাজের পরাজয় ঘটুক, জার্ম্মাণী বিজয়ী হউক। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর পরাজয় হইল, ভারতের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আসন অটুট রহিল। হিণ্ডেনবুর্গের আত্মজীবনীতে পরে পড়িয়াছিলাম জার্ম্মাণীর পরাজয়ের জন্য জার্ম্মান শ্রমিকেরাই দায়ী। তাহারাই 'পশ্চাৎভাগ হইতে ছুরিকাঘাত করিয়া জার্ম্মাণীর পরাজয় ঘটাইয়াছে'। তখন হিণ্ডেনবুর্গের এই কথাটি আমার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন সংবাদপত্রাদিতে ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছিলাম, বিপ্লব পথের রোমাঞ্চকতার অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মপদ্ধতির সহিত উহার তুলনা করিয়া মনে করিতাম শ্রমিক আন্দোলন অ-রাজনৈতিক, কেবলমাত্র আহার্য্য বৃদ্ধির আন্দোলন, নিতান্তই সামান্য, তুচ্ছ, প্রকাশ্য, বিপদদুঃখহীন লেখনীর ও বক্তৃতার আন্দোলন। শ্রমিক আন্দোলন ভারতে কখনও পুষ্টিলাভ করে নাই, উহার আভ্যন্তরীণ প্রচণ্ড শক্তি সম্পর্কে আমার তখনও কোন ধারণাই ছিল না, রুশিয়ার শ্রমিক বিপ্লব সম্পর্কে আমি তখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞ, বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের সহিত তখনও আমি অপরিচিত। তাহা

ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর সহিত যে একটিবার মাত্র আমার মেলামেশা করিবার সুযোগ হইয়াছিল তাহা হইতেছে চট্টগ্রামে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সময়। সেই সময় শ্রমিকদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া উহাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জ্ঞানের সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনতা দেখিয়া শ্রমিক শ্রেণীকে কখনও রাজনৈতিক শক্তি অথবা বিপ্লবী বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। বরং বারবার এই কথাই মনে হইয়াছে যে, উহাদের মত দুর্দ্দশাগ্রস্তদের জন্যই বিপ্লব সার্থক করা প্রয়োজন।

"শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শ, মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, মার্ক্সবাদী সমাজ-বিজ্ঞান, আমায় নূতন আলোকের, নূতন পথের সন্ধান দিল। শ্রেণীমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর দিয়া আমি মানব সমাজের যথার্থ নূতন পরিচয় পাইলাম। সমাজ পরিবর্ত্তনের গতি ও প্রকৃতি বুঝিতে পারিলাম, অতীত ইতিহাসের অর্থ জানিতে পারিলাম। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ভিতর আমি আমার সমস্ত কঠিন সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইলাম। রুশিয়ার শ্রমিক বিপ্লব মাত্র পনেরো বৎসরের মধ্যে যে অচিন্তনীয় সফলতা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার পরিচয় পাইয়া আমার মন এক অভূতপূর্ব্ব প্রেরণায় ভরিয়া উঠিল। শোষণ-নিপীড়নহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়া রুশিয়ার শ্রমিকরা সমগ্র জনগণের জন্য যে অবাধ সীমাহীন উন্নতির অধিকার এবং সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই ত মানব জীবনের জন্মগত অধিকার, তাহাই ত সার্থক বিপ্লবের যথার্থ লক্ষ্য, তাহাই ত প্রত্যেক বিপ্লবীর প্রকৃত আদর্শ।

"আমার ভবিষ্যৎ কর্ম্ম জীবনের পথ আমার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে আমি নিজেকে কমিউনিষ্ট বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম।

"নিজেদের সাম্যবাদী মনে করিবার সাথে সাথেই প্রশ্ন জাগিয়াছে: তাহা হইলে অন্যান্য সমমতাবলম্বী বিপ্লবী দল ও ব্যক্তিবর্গের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিয়া না গিয়া নিজেদের দলীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার প্রয়োজন ও সার্থকতা কোথায়? কমিউনিষ্ট মতাবলম্বীদের মধ্যে যে কঠোর গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বর্ত্তমান তাহাতে স্বতঃই আমার মন ইহার বিরুদ্ধে বিমুখ ও বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। পুরাতন বিপ্লবী দলে নেতৃবর্গের ক্ষমতা ও প্রভাব অপরিসীম ছিল। নেতৃত্বের আসন পরিত্যাগ করিয়া কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র

মানিয়া নিজেকে একজন সাধারণ সৈনিকের ন্যায় উহার কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতাধীন হইতে স্বীকার করিবার পথে নেতৃত্বের মোহ এবং ক্ষমতার স্পৃহা প্রভৃত পরিমাণে বাধা সৃষ্টি করে। বিশেষ করিয়া বেশী বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের পক্ষে কখনও কখনও ওই বাধা সম্পূর্ণরূপে অলঙ্ঘনীয় হইয়া দাঁড়ায়। তখনকার কথা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। তখন আমি নিজেকে যথার্থই কমিউনিষ্টপন্থী, মার্ক্স-লেনিন-স্টালিন পন্থী বলিয়া মনে করি। ভাঙা ভাঙা বিশ্লেষণে মনের নিজস্ব মোহ ও নেতৃত্বের স্পৃহা খুঁজিয়া পাই নাই। তখন এই কথাটাই খুব সুদৃঢ় যুক্তি বলিয়া মনে হইত যে আমরাই শুধু যথার্থ বিপ্লবী ; আমরাই মৃত্যু উপেক্ষা করিয়া নিজেদের বিপ্লবী নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার অনস্বীকার্য্য পরিচয় দিয়াছি, মার্ক্স-লেনিনের ঐতিহ্য কেবলমাত্র আমরাই বহন করিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম, লেনিন-স্টালিনের নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করিবার সামর্থ্য আমাদের অপেক্ষা অন্য কাহারও অধিক নাই। আমরাই যথার্থ বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি গড়িয়া তুলিব।

"কিন্তু নিজের চিন্তার ভিতর একটি প্রশ্নের উত্তর আমি সেই সময় খুঁজিয়া পাইতাম না। আমরা একটি নূতন কমিউনিষ্ট পার্টি গড়িয়া তুলিলেও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি একদিনেই নিশ্চিহ্ন হইবে না, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্তেরা আমাদের বিজ্ঞপ্তি পড়িয়াই কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে আস্থাহীন হইয়া আমাদের নিকটে সমবেত হইবে না। তদুপরি শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কাজ করিবার কোন অভিজ্ঞতাই আমাদের নাই। উহাদের ভিতর যখন আমরা কাজ করিতে যাইব, তখন ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি ব্যতীত কমিউনিষ্ট ও সোশালিষ্ট বলিয়া পরিচিত আরও দল ও ব্যক্তির বিরোধিতার সম্মুখীন আমাদের হইতে হইবে। ইহাদের সমবেত বিরোধিতার সম্মুখে আমাদের জয়ী হইবার সম্ভাবনা ও সামর্থ্য কোথায় ? এই নূতন আদর্শ, নূতন লক্ষ্য ও নূতন কর্ম্মপথে নির্ভুল ভাবে চলিবার ও জনগণকে পরিচালিত করিবার যথোপযুক্ত যোগ্যতা আমাদের আছে কি ? কেবলমাত্র অতীতের বিপ্লবী নিষ্ঠা ও বিপ্লবের প্রতি বর্ত্তমান ঐকান্তিকতার গভীরতাই ত বিপ্লবের সাফল্য আনিয়া দিবে না ?

"সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারিতাম, যদি আমরা আমাদের নূতন কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে ভারতের সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক জনসাধারণকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমবেত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের এই কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রমিকদের ভিতর বিভিন্ন পার্টির মধ্যে অধিকন্তু আর একটি পার্টিতে পরিণত হইবে। ইহাতে শ্রমিকেরা লাভবান হইবে না, ইহাতে উহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হইবে। ইহাতে বিপ্লবী শক্তি সমূহকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে।

"এই চিন্তা গুলি সেই সময় আমাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিত। ব্যক্তিত্বের মোহ, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের স্পৃহা যে গোপন মনের পশ্চাতে থাকিয়া যুক্তি-জালের ভিতর দিয়া বিভ্রান্ত ও বিপ্লব-বিরোধী পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা সহজে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। নিজের বিপ্লবী নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার উপর আমার এতখানি ভ্রান্ত আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, দিনের পর দিন আত্মবিশ্লেষণেও কখনও মনের দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে নাই। সব সময়েই মনে হইয়াছে আমার যুক্তিগুলি যথার্থই বিপ্লবী যুক্তি।

"যে সমস্ত কুসংস্কার ও মোহমুক্ত তরুণ বিপ্লবী বন্ধুদের সহিত দিবারাত্রির সারাক্ষণ কাটাইতে হইত, তাহাদের সহিত অবিশ্রান্ত আলোচনার ভিতর দিয়া ক্রমশঃ আমি পথ দেখিতে পাইলাম। আমার অজ্ঞাত মনের মোহ ও বিভ্রান্তি, আমার দুর্ব্বলতা সমূহ ক্রমশঃ আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া উঠিল। আমি সমস্ত মোহ কাটাইয়া প্রকৃত বিপ্লবীপথ অনুসরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলাম।

"অল্প আয়াসেই তখন আমি বুঝিলাম প্রকৃত সাম্যবাদীর স্থান কখনও কমিউনিষ্ট পার্টীর বাহিরে হইতে পারে না। শ্রমিক শ্রেণীর নূতন আর একটি 'যথার্থ-বিপ্লবী' পার্টি গড়িয়া তোলার সরল অর্থ হইতেছে নিজের মোহ, অহমিকা ও নেতৃত্ব আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার প্রচেষ্টা মাত্র। উহা শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর বিভেদ সৃষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়, উহা বিপ্লবী শ্রেণী-সমূহকে বিভ্রান্তই করে। তাই লেনিন পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাম্যবাদীদের লইয়া একটি মাত্র সুদৃঢ় পার্টি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাই মার্ক্স জগতের সমস্ত জাতির শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি নিঃসংশয়ে বুঝিলাম, যাহারা শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যে বাধা সৃষ্টি

করে, তাহারা বিপ্লবের বিরোধিতাই করে ; যাহারা মুখে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করিয়াও কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে ঐক্যবদ্ধ হইতে অস্বীকার করে তাহারা যথার্থ মার্ক্স-লেনিনপন্থী নয়, তাহারা যথার্থ বিপ্লবী নয়।

"এই সময়ই আমরা আন্দামানের নির্ব্বাসন হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসি এবং এই সময় হইতে আমি নিজেকে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির, লেনিন-স্টালিনের পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীন বলিয়া মনে করিতে থাকি।

"এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের মানসিক পরিবর্ত্তন কেবল মাত্র মার্কস-লেনিন-স্টালিনের পরিচিত লেখা মৌলিক তত্ত্ব ও নীতির ভিত্তিতেই হইয়াছে। জনগণের সহিত আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নই, উহাদের সাধারণ চিন্তাধারা, উহাদের জীবনপদ্ধতি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সাম্যবাদীদের বাস্তব কার্য্য পদ্ধতি কিরূপ তাহা কিছুই জানি না, জনগণের ভিতর কাজের সময় কিরূপ বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয় সে সম্পর্কে কোন ধারণা নাই। বাস্তব কাজের সহিত কোন প্রকার সংস্পর্শহীন কেবলমাত্র তত্ত্ব ও চিন্তার ভিতর দিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইয়াছে বলিয়া, বহু প্রকার বাধা বিঘ্ন বিচ্যুতি অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি উৎপাদন করিবার প্রয়াস করিয়াছে, কিন্তু যথার্থ বিপ্লবী নিষ্ঠা ও অকপট বিশ্লেষণ সব ক্ষেত্রেই শেষ পর্য্যন্ত আমাকে প্রকৃত নির্ভুল পথের সন্ধান দিয়াছে।

"ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি, উহার কার্য্যক্রম বা উহার নেতাদের সম্পর্কে আমি প্রায় কিছুই জানিতাম না। কিন্তু দেশের জেলে ফিরিয়া আসার পর বিভিন্ন বই ও কাগজ-পত্রের ভিতর দিয়া ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি ও কার্য্যপদ্ধতি সম্পর্কে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা অনেক কিছু জানিতে পারি। কংগ্রেসের প্রতি কমিউনিষ্ট পার্টির মনোভাব, ত্রিপুরী কংগ্রেসে কমিউনিষ্ট পার্টির অবলম্বিত নীতি, ফরোয়ার্ড ব্লকী বিভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী মূলক কর্ম্মপন্থা প্রভৃতি জানিতে পারিয়া ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির উপর আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বহুগুণ বাড়িয়া সুদৃঢ় হইয়াছে।

"ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কাজ, ভারতের শ্রমিক ও কৃষকদের উপর ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব, ভারতীয় কমিউনিস্ট

পার্টির নেতৃবর্গের উজ্জ্বল গৌরবময় অতীত, শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে উঁহাদের অপরিসীম লাঞ্ছনা ও দুঃখভোগের ইতিহাস ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টীর উপর আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অটুট করিয়া তুলিয়াছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির নীতিই ভারতীয় জনগণের যথার্থ মুক্তির পথ উন্মুক্ত ও সুগম করিয়া তুলিবে। আমি বিশ্বাস করি, আমার জীবনের লক্ষ্য ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির পরিচালনায় সুনিশ্চিতভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিবে।"

লোকনাথ বল

ইনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ষড়যন্ত্র মামলার আর একজন বন্দী।

ছাত্রজীবনে ছাত্র ও যুব আন্দোলনে চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে তাঁহার অসামান্য খ্যাতি ছিল। তিনি ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং ১৯২৪ হইতে ২৮ সাল পর্য্যন্ত বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন। ইনি চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস ও বি, পি, সি, সির সভ্য ছিলেন।

ইনি ১৯৩০ সালে ফরাসী চন্দননগরে ধৃত হইয়া চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং পরে আন্দামানে প্রেরিত হন।

সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন একথা তিনি খুব স্পষ্ট ভাষায় দেশবাসীকে ও গান্ধীজীকে জানাইয়াছেন।

জেলে তাঁহার ১৪ বছর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত রক্তের চাপ ও হৃদরোগে কষ্ট পাইতেছেন। বর্ত্তমানে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে আছেন।

লালমোহন সেন

ছাত্রজীবনে তিনি প্রথমে রোগীর সেবা ও সাধারণ জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৮-২৯ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন কর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রামে যে জেলা কংগ্রেস সম্মেলন হয়, তিনি তাহাতে যোগ দেন এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ঐ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী যতীন দাসের অনশন ধর্ম্মঘটের ফলে মৃত্যুর জন্য চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং শহীদ যতীন দাসের সম্মানার্থে এক

শোভাযাত্রা বাহির হয়—লালমোহন ঐ আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। তিনি তাঁহার নিজ জন্মস্থান সন্দীপ সহরে কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ সংগঠক ছিলেন।

এই সময়ে তিনি গুপ্ত বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের অভিযোগে স্পেশাল ট্রাইবিউনালের বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনিও আন্দামানে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

আন্দামানে ও আলীপুরে যে বিখ্যাত অনশন ধর্ম্মঘট হইয়াছিল তিনি তাহাতে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি আর সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন এবং জেলে কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ঢাকা জেল হইতে যে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী বিবৃতি বন্দীরা দিয়াছিলেন, তিনি তাহার একজন স্বাক্ষরকারী।

জেলে তাঁহার ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সুখেন্দু দস্তিদার

সুখেন্দু ছাত্র অবস্থায় ছাত্র আন্দোলনের কর্ম্মী ছিলেন। তিনি মাত্র ১৬ বছর বয়সে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আন্দামানে প্রেরিত হন।

তাঁহাদের পরিবারে তাঁহার কাকা ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ছিলেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময়ে তাঁহার এক ভাই অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার জালালাবাদ পাহাড়ে পুলিসের সহিত সংঘর্ষে মারা যান এবং তাঁহার অন্যান্য চার ভাই বিনা বিচারে আটক ছিলেন। ইনিও কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ৬০ বৎসরের বৃদ্ধা মা চট্টগ্রাম জেলা মহিলা সমিতির সভানেত্রী।

অতি তরুণ বয়স বিবেচনায় স্পেশাল ট্রাইবিউনাল দণ্ডাদেশের সময় তাঁহার ও অন্য তিনজন অভিযুক্তদের সম্বন্ধে বাংলা সরকারের কাছে ৫ বছর দণ্ডভোগের পরে মুক্তির সুপারিশ করিয়াছিলেন। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ট্রাইবিউনালের সুপারিশ অনুযায়ী অন্য তিন জনকে ১৯৩৮ সালে মুক্তি দিয়াছিল কিন্তু কমরেড সুখেন্দুকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। জেলে তাঁহার ১৫ বছর কাটিয়া গিয়াছে।

সহায়রাম দাশ

সহায়রাম মাত্র ১৬ বছর বয়সে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং আন্দামানে প্রেরিত হন।

তিনি ছাত্র জীবনে বিশিষ্ট ছাত্র কর্ম্মী এবং কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন।

জেলে তিনি কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ১৫ বৎসর দণ্ডভোগ শেষ হইয়াছে—এখনও মুক্তি পান নাই। ঢাকা জেল হইতে বন্দীরা যে বিবৃতি দেন তাহাতে ইনিও স্বাক্ষর করেন। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন।

সুবোধ চৌধুরী

সুবোধ ছাত্র বয়সে ছাত্র ও যুব আন্দোলনের নেতা ছিলেন—পরে কংগ্রেস কর্ম্মী হিসাবে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেন। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সংগঠক।

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং পরে আন্দামানে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তিনি আর সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন এবং জেলে কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৪২ সালে ঢাকা জেল হইতে বন্দীরা যে ফ্যাশিস্ট-বিরোধী বিবৃতি দিয়াছিলেন তিনি তাহার একজন স্বাক্ষরকারী। জেলে তাঁহার ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—এখনও মুক্তি পান নাই।

চাঁদপুর পুলিস ইন্সপেক্টর-হত্যা মামলা

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঘাঁটির উপরে যখন ঐরূপ আর সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ সম্ভব ছিল না, তখন বিপ্লবীরা পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের হত্যার নীতি গ্রহণ করে। ফলে সমস্ত বাংলাদেশে ঐরূপ হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হইতে থাকে। চাঁদপুর ইন্সপেক্টর হত্যা ঐরূপ ঘটনাবলীর মধ্যে একটি।

ঢাকায় পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যানকে কিছুদিন আগে বিপ্লবীরা রিভল্‌বারের গুলিতে নিহত করে। মিঃ ক্রেইগ পরে এই পদের অধিকারী হন। সন্ত্রাসবাদী যুবকদের পরিকল্পনা যে, এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার ফলে বাংলায় পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলের পদ শূন্য পড়িয়া থাকে। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার পলাতক বিপ্লবীরা ঠিক করে যে মিঃ ক্রেইগকেও হত্যা করিতে হইবে।

দুই জন ফেরারী বিপ্লবী পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী মিঃ ক্রেইগ যে গাড়ীতে চট্টগ্রাম হইতে চাঁদপুরে আসিতেছিলেন সেই গাড়ীতে তাঁহার অনুসরণ করেন। গাড়ী চাঁদপুর পৌঁছিলেই প্রস্তুত হন। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ীর দরজা খুলিয়া যায়। একজন পদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী ট্রেণ হইতে নামেন। সঙ্গে সঙ্গে সারি বাঁধা পুলিস সামরিক কায়দায় সেলাম জানায়। সন্দেহের লেশ মাত্র নাই—ইনি নিশ্চয়ই মিঃ ক্রেইগ। ঠিক তেমনি দৈর্ঘ্য, তেমনি গৌরবর্ণ, গায়ে শীতের ওভারকোট। মুহূর্ত্তের মধ্যে বিপ্লবীরা তাঁহার উপরে লাফাইয়া পড়ে এবং এগারটি গুলি ক্রেইগের গায়ে নিঃশেষ হয়। তাঁহারা নিশ্চিত হয় মিঃ ক্রেইগ ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন।

কিন্তু পরের দিন সকালে তাঁহারা তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারেন যে ক্রেইগ মরেন নাই। মিঃ ক্রেইগের মত পোষাকে সজ্জিত রেলওয়ে পুলিসের ইনস্‌পেক্টার তারিণী মুখার্জ্জীকে সঙ্গে লইয়া মিঃ ক্রেইগ ঐ গাড়ীর অপর কামরায় যাইতেছিলেন। রাত্রির অন্ধকারে তারিণী মুখার্জ্জীকেই হত্যা করা হইয়াছে। একজন রেলওয়ে পুলিসের ভারতীয় কর্ম্মচারীকে হত্যার উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না।

এই সম্পর্কে ১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার পলাতক রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্ত্তী নামে দুই জন যুবক চাঁদপুর হইতে ২২ মাইল দূরে হাজিপুর ষ্টেসনে ধৃত হন। রামকৃষ্ণের নামে ঐ মামলা সম্পর্কে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। যাঁহারা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন পরিকল্পনার উদ্যোগী শ্রীযুত রামকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কিন্তু অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কিছুদিন আগে বোমা তৈয়ারীর জন্য বিস্ফোরণ লইয়া পরীক্ষার সময়ে তিনি গুরুতররূপে আহত

হন, ফলে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শ্রীযুত কালী চক্রবর্ত্তীর নামেও ঐ মামলা সম্পর্কে ফেরারী বলিয়া গ্রেপ্তারের জন্ত পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল।

কলিকাতায় এক স্পেশাল ট্রাইবিউনালের বিচারে শ্রীযুত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী ও অল্প বয়স. বিবেচনায় শ্রীযুত কালী চক্রবর্ত্তীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। পরে ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে আলীপুর জেলে শ্রীযুত রামকৃষ্ণের ফাঁসী হইয়া যায়। শ্রীযুত কালী চক্রবর্ত্তী এখনও জেল খাটিতেছেন।

কালী চক্রবর্ত্তী

কালী চক্রবর্ত্তী বাল্য জীবনেই চট্টগ্রাম সহরের মহল্লায় মহল্লায় আর্ত্তের সেবা, রোগীর শুশ্রূষায় ছিলেন সকলের অগ্রণী। ঐ বয়সেই তিনি চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুবক মহলের প্রিয় "পণ্ডিতদা" বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

তাঁহার মানব প্রীতি ও সমাজসেবা তাঁহাকে শীঘ্রই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে টানিয়া আনে। তিনি অচিরে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও সংগঠক হিসাবে সুপরিচিত হন। ঐ সময়ে তিনি তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে ব্যয়ের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন।

বিপদ সঙ্কুল কাজে তাঁহার স্থান ছিল সবার আগে—সহকর্ম্মীদের প্রতি মমত্ববোধে তাঁহার তুলনা মেলা কঠিন।

জেলে যাওয়ার আগে কাজে তাঁহার যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, জেলের ভিতরেও নিজের শিক্ষাদীক্ষায় তিনি তাহা কাজে লাগান। ছোট বয়সে স্কুল জীবনেই তাঁহার শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। জেল জীবনের অবসর সময়ের সুযোগে ইংরেজী শিখেন। দুই বৎসর অবিরাম পরিশ্রমের পর তিনি বিভিন্ন মতবাদের গ্রন্থাদি পড়িতে আরম্ভ করেন, সঙ্গে সঙ্গে অতীতের কাজের উপর সমালোচনা করিতে থাকেন এবং অবশেষে কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। জেলে তাঁহার দীর্ঘ ১৮ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

আশানুল্লা হত্যা মামলা

হরিপদ ভট্টাচার্য্য

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে চট্টগ্রামে আমলাতন্ত্রের নিষ্পেষণ নীতি চালু হয়। খানাতল্লাস, সান্ধ্য আইন, পাইকারী জরিমানা, পিউনিটিভ পুলিস কিছুই বাদ যায় না। ইহার ফলে চট্টগ্রামের স্বাভাবিক জীবন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। যে সব সরকারী কর্ম্মচারী এই নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যাক্তিগতভাবে বাড়াবাড়ি করার ফলে সহরবাসী জনসাধারণের অসন্তোষ ও বিরাগভাজন হন, তাঁহাদের মধ্যে স্থানীয় গোয়েন্দা পুলিশের ইন্সপেক্টর মিঃ আশানুল্লা ছিলেন প্রধান। ফলে, ১৯৩১ সালের জুন মাসে মিঃ আশানুল্লা সহরের পল্টন মাঠে বিপ্লবীদের গুলীতে নিহত হন। ঐ সম্পর্কে ঘটনাস্থলে হরিপদ ভট্টাচার্য্য নামে ১৫ বৎসর বয়স্ক একটি ছাত্র ধৃত হন। ধৃত হওয়ার পরে তাঁহাকে তাঁহার নিজ গ্রামে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাঁহার সম্মুখে তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে গাছের সহিত বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, হরিপদকে দিয়া স্বীকারোক্তি করান। কিন্তু হরিপদ অটল। শোনা যায়, ইহার পরে তাঁহাদের বাড়ী তাঁহারই চক্ষুর সম্মুখে পুলিস জ্বালাইয়া দেয়। তাঁহার পিতাকে, তাঁহার মা ও ছোট ভাই বোনদের হাত ধরিয়া রাস্তায় দাঁড়াইতে হইবে। পুলিস প্রলোভন দেখায় যে কাহাদের পরামর্শে তিনি এই কাজ করিয়াছেন তাহা বলিলেই, তাঁহার পরিবারের দুরবস্থা থাকিবে না—প্রচুর অর্থ তিনি পাইবেন। কিন্তু দেশপ্রাণ হরিপদকে কিছুতেই পুলিশ কোনরূপ স্বীকারোক্তি করাইতে সমর্থ হয় নাই। দায়রা বিচারে অধিকাংশ জুরী তাঁহাকে সন্দেহের অবকাশে নিরপরাধ বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। দায়রা জজ জুরীদের সহিত একমত না হইতে পারিয়া মামলা হাইকোর্টে পেশ করেন। হাইকোর্ট হইতে শ্রীযুত হরিপদ ভট্টাচার্য্যের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের হুকুম হয়। তিনি এখন ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে আছেন। তিনি আর সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন এবং কমিউনিষ্ট মতবাদ পোষণ করেন। জেলে তাঁহার ১৭ বৎসর দণ্ডভোগ শেষ হইয়াছে।

আলফ্রেড্ ওয়াট্‌সন হত্যা-প্রচেষ্টা মামলা

১৯৩২ সালে ইংরেজী দৈনিক ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মিঃ আলফ্রেড ওয়াটসন। ষ্টেটস্‌ম্যান ছিল তখন ভারতীয় আশা আকাঙ্খার বিরোধিতার মুখপত্র। তাই তিনি ছিলেন বাংলার বিপ্লবীদের একজন প্রধান শত্রু। আবার এদিকে বিলাতের গোঁড়া রক্ষণশীল নীতির প্রচারক হওয়ায় পুরস্কার হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা মিঃ ওয়াটসনকে পরে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন।

আইন অমান্য আন্দোলন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও কয়েকজন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী বিশেষ করিয়া ঢাকা সহরে বাংলার পুলিস ইন্‌সপেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যান, মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ প্যাডী, চট্টগ্রামের গোয়েন্দা পুলিশ মিঃ আশানুল্লা বিপ্লবীদের গুলীতে প্রাণ দেওয়ায় বাংলার বুকে যে দমন নীতি সুরু হইয়াছিল, বাংলার জাতীয়তাবাদীরা সে জন্ম ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা ও উহার সম্পাদক মিঃ ওয়াটসনের উস্কানীকে অনেকটা দায়ী করিয়াছিলেন। ভারতের আশা আকাঙ্খা সম্বন্ধে মিঃ ওয়াটসনের অপমানকর উক্তি প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীকে উত্তেজিত করিয়া তুলিত।

মিঃ ওয়াটসনকে হত্যার লক্ষ্য হিসাবে বাছিয়া লওয়ার ইহাই ছিল প্রধান কারণ। ১৯৩২ সালে তাঁহার উপরে দুই দুইবার আক্রমণ হয়। প্রথম আক্রমণ হয় ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে, মিঃ ওয়াটসন নিহত হইয়াছে মনে করিয়া যুবকটি নিজেও বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ২ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় আক্রমণ হয় ১৯৩২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর। তাঁহার দৈনন্দিন সম্পাদকীয় কাজ শেষ করিয়া তিনি তাঁহার গাড়ীতে ক্লাবে যাইতেছিলেন। হঠাৎ পিছন হইতে একটি মোটর বেগে চালাইয়া তাঁহার চলন্ত গাড়ীর সামনে আসিয়া উহাকে থামাইতে বাধ্য করে এবং গাড়ীর মধ্য হইতে রিভলবার দ্বারা তাঁহার উপর আক্রমণ চলে—মিঃ ওয়াটসন আহত হন। নিকটস্থ পুলিস বিপ্লবীদের ধরিতে আগাইয়া আসে। তাঁহারাও মিঃ

ওয়াটসনকে নিহত মনে করিয়া গাড়ী চালাইয়া চলিয়া যাইতে থাকেন—পুলিশ দল তাঁহাদের পিছনে ধাওয়া করে, অন্ধকারে বেহালার কাছে একটি লাইট পোষ্টে ধাক্কা খাইয়া গাড়ীখানা ভাঙ্গিয়া যায়, যুবক তিনটি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন পুলিসের হাতে ধরা না দিয়া বিষপানে আত্মহত্যা করেন। তৃতীয় যুবকটি গণ্ডগোলের সুযোগে সরিয়া পড়েন এবং কিছু দূরে যাইয়া স্থানীয় একটি লোকের সাহায্যে মোটরে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে একটি বাড়ীর সামনে আসিয়া নামেন এবং পরে পলাইয়া যান। যুবকটির ভাবভঙ্গীতে গাড়ীর চালকের সন্দেহ হয় তাই সে পুলিসে খবর দেয়। পুলিস ঐ রাত্রে একজনকে গ্রেপ্তার করে এবং পরের দিন সকালে সুনীল চট্টোপাধ্যায় নামে আর একজন ফেরারী বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনাবলীর ভিত্তিতে ঐ ষড়যন্ত্র মামলা চলে।

সুনীল চ্যাটার্জি

১৯৩২ সাল। ১৯৩০-৩১ সালে সারা বাংলায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবাত্মক কাজের যে ঢেউ চলিয়াছিল, তখন তাহাতে অনেকটা ভাঁটা পড়িয়াছে। পুলিশের অত্যাচর যখন চরমে পৌঁছিয়াছে—সন্ত্রাসবাদী দলগুলির অধিকাংশ নেতা ও বিশিষ্ট কর্ম্মী তখন জেলে আবদ্ধ।

সেই সময় পুনরায় কয়েকটী সন্ত্রাসবাদী ঘটনা গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি করে। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ ওয়াটসনকে হত্যার চেষ্টা, এমনি একটি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা। এই মামলায় সুনীল ধৃত হয় ও সুনীলকে ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেওয়া হয়। তারপর তাঁহাকে আন্দামানে পাঠান হয়।

মামলার রায়-এ জজসাহেব মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, সুনীলের মত ভয়ঙ্কর লোকের ফাঁসি হওয়াই উচিত ছিল—শুধু মাত্র আইনের জন্য তাহা দেওয়া গেল না। তখনকার 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা লিখিয়াছিল যে, সুনীলকে ফাঁসি দেওয়াই উচিত এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে তার জন্য 'বিশেষ আইন' প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

বাংলার শাসকগোষ্ঠী যাঁহাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলাইবার জন্য এত উদগ্রীব ছিল, সেই সুনীল কিন্তু জেলে আসিয়াই সমস্ত রাজনৈতিক কয়েদীদের প্রিয় 'সুনীল দা'

হইয়া দাঁড়ান এবং জেলের সাধারণ কয়েদীরাও তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের জন্য তাঁহাকে অসীম ভক্তি করিত।

*   *   *   *   *

চব্বিশপরগণা জেলার জয়নগর মজিলপুরের নিকটবর্তী গ্রাম গঙ্গাহাটা সুনীলের জন্মস্থান। তাঁহার পিতা মজঃফরপুরে ওকালতি করিতেন। সেখানেই সুনীলের বাল্যকাল কাটে। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী। মার মুখে ক্ষুদিরামের কাহিনী শুনিয়াই বালক সুনীলের মনে প্রথম দেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা সুনীল ও তাঁহার অন্য দুইটি ছোট ছোট ভাইবোনকে নিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। সেই গ্রামে 'যুগান্তর' দলের একটি কেন্দ্র ছিল এবং সুনীল তাঁহাদের সংস্পর্শে আসেন। তখন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নানা কাহিনী তিনি শোনেন এবং সন্ত্রাসবাদের পথে নিজকে উৎসর্গ করেন। অতি শীঘ্রই সুনীল স্থানীয় স্কুলের একজন ভাল ছাত্র ও ছাত্রদের একজন নেতা হইয়া উঠেন। সুনীল ছিলেন স্কুলের বিতর্ক সভার (ডিবেটিং ক্লাব) সম্পাদক। তখন ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের বিরাট জাগরণ। সুনীল নানাপ্রকার বই হইতে ছাত্রদের কংগ্রেসের ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কাহিনী পড়িয়া শুনাইতেন। এইভাবে তাঁহার উদ্যোগে একটি দল গঠিত হয়। তাঁহারা আপদে বিপদে স্থানীয় লোকদের সাহায্য করিতেন।

১৯২৪ সালে সুনীল কলিকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। তখন তিনি পুরাদস্তুর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী। কলেজের ভিতর ভাল ছাত্র বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল এবং ছাত্রদের নিয়া দল গঠন করা, বিভিন্ন গুপ্ত কেন্দ্রের ভিতর খবর আদান প্রদান—এসব কাজ সুনীল অতি দক্ষতার সহিত করিতেন। কলিকাতায় তিনি দুই একজন সোসালিষ্টপন্থীর সঙ্গে পরিচিত হন—এবং ২।১ খানা মার্ক্সীয় বইও পড়েন। এই সময় 'প্লুরিসি' রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি পুরুলিয়ায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য যান। সেখানে গান্ধীজীর বক্তৃতা শোনেন যে, জনগণের ভিতর সেবার কাজ

করিতে হইবে। ইহা তাঁহার মনকে দোলা দেয়। সোসালিষ্ট বন্ধুদের কথাও তাঁহার মনে পড়ে।

পুরুলিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি ভাটপাড়াতে গিয়া তাঁহার পুর্ব্ব পরিচিত একজন তথাকথিত শ্রমিক নেতার সঙ্গে শ্রমিকদের ভিতর কাজ সুরু করেন। তিনি শ্রমিকদের দরখাস্ত ইত্যাদি লিখিয়া দিতেন এবং শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য যে ফ্রী প্রাইমারী স্কুল ছিল তাহাতে শিক্ষকতা করিতেন। অতি অল্পদিনেই তিনি শ্রমিক ছেলেমেয়েদের এবং স্থানীয় শ্রমিকদের প্রিয় হইয়া উঠেন। তখন সেখানে শ্রমিকদের একটি ধর্ম্মঘট হয় কিন্তু নানা দুর্বলতার জন্য সেই ধর্ম্মঘট ব্যর্থ হয়। সুনীলের স্কুলও কিছুদিন পরই ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে। তাহার পর সুনীল যুগান্তর দলের নেতাদের নির্দ্দেশে পুনরায় ছাত্র ও যুবক মহলে তাঁহার কাজ আরম্ভ করেন। বোমা ইত্যাদি তৈয়ার করার জন্য রসায়ন বিজ্ঞানজ্ঞান দরকার—সেই জন্যই সুনীল যাদবপুর কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ২।১ বৎসরের মধ্যেই যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেন। সাধারণ ছাত্রদের ভিতর তাঁহার সুনামও ছিল প্রচুর। ১৯২৯-৩০ সালে বাংলাদেশে যে ছাত্র জাগরণ হয়, সুনীল ছিলেন তাঁহার অন্যতম নেতা। এই সময়ে তিনি চব্বিশ পরগণা জিলা কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার উদ্যোগে ও অক্লান্ত পরিশ্রমেই চব্বিশ পরগণার 'আবাদ' অঞ্চলের লোকদের ভিতর প্রথম স্বাদেশিকতার বাণী প্রচারিত হয়। সুনীল চ্যাটার্জি এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কংগ্রেসের কথা প্রচার করিয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত সমিতিও গঠন করিতে থাকেন।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে ২৪ পরগণায় অনেকগুলি 'সত্যাগ্রহী শিবির' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জেলায় সুনীলের নেতৃত্বে যে সন্ত্রাসবাদী দলটি গঠিত হইয়াছিল, সেই দলের সভ্যরা সত্যাগ্রহের জন্য বিভিন্ন গ্রামের যুবকদের উৎসাহিত করিয়া ভলাণ্টিয়ার দল গঠন করিয়াছিলেন। এই সময়ে সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের নানাপ্রকার প্রস্তুতি সুনীলের মারফত চলিতে থাকে। অন্যদিকে, সুনীল সাইকেলে করিয়া বিভিন্ন 'সত্যাগ্রহী শিবিরে' ঘুরিতেন, ভলাণ্টিয়ারদের উৎসাহ দিতেন এবং সন্ত্রাসবাদী দলের জন্য নূতন নূতন যুবক সংগ্রহ করিতেন।

স্বাধীনতার জন্য তাঁহার অত্যুগ্র কামনা, তাঁহার তেজস্বিতা বহু যুবকের মনেই স্বদেশের জন্য চূড়ান্ত আত্মত্যাগের প্রেরণা জাগাইয়াছিল।

* * * * *

জেলে আসিয়াও সুনীল একদিনের জন্যও তাঁহার মনের তেজস্বিতা হারান নাই। জেল কর্ত্তৃপক্ষের কোন অন্যায় আচরণ সুনীল কোন দিনই সহ্য করেন নাই। এজন্য বহুবার তাঁহাকে নানাপ্রকার নির্য্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছে।

সুনীলের মন অন্যদিকে ছিল বৈজ্ঞানিক ছাঁচে ঢালা। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছাড়া তিনি কোন বিষয়ই গ্রহণ করিতেন না। আবার কোন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি উপস্থিত করিতে পারিলে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণা যাহাই থাক না কেন, তিনি তখন তাহা সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করার ইতিহাসও ঠিক তাহাই। ১৯৩৪ সালে আন্দামান জেলে তিনি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিবেন বলিয়া গভীরভাবে কমিউনিজম পড়িতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স-লেনিনের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি তাঁহার মনকে ভীষণভাবে দোলা দিতে আরম্ভ করে এবং কয়েকমাস পর তিনি কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন।

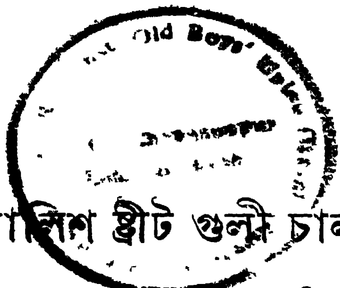
এ-ছাড়া, নানা বিষয়ে সুনীলের পাণ্ডিত্য ও অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিত। যে বই সুনীল একবার পড়িতেন সেই বইয়ের কোন্ পাতায় জরুরী বিষয়টী লিখিত আছে বহুদিন পর্য্যন্ত অনায়াসে তিনি তাহা বলিতে পারিতেন। কোন রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ কিংবা সন তারিখ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গড় গড় করিয়া সঠিক উত্তর দিয়া যাইতেন।

* * * * *

এই দেশপ্রেমিক, তেজস্বী, মেধাবী যুবক আজও কারারুদ্ধ। ইহা পরাধীনতারই অভিশাপ। কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য কি ?



দীর্ঘ মেয়াদী আন্দামান বন্দীদের মুক্তি আন্দোলনে কলিকাতায় ছাত্রদের বিরাট শোভাযাত্রার একাংশ—১৯৩৭।



কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট গুলী চালনা মামলা

১৯৩৩ সালের জুন মাসের এক সকালবেলা কলিকাতায় একদল সশস্ত্র পুলিস ও সার্জ্জেণ্ট কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের একটি বাড়ী ঘেরাও করে। বাংলায় তখন এণ্ডারসনী শাসন। মুহূর্ত্তের মধ্যে পাড়ার ও রাস্তার লোকের মনে হইল যে, এই বাড়ীতে কোন বিপ্লবী পলাতক অবস্থায় আত্মগোপান করিয়া রহিয়াছেন। পুলিস খবর পায়, মেদিনীপুর জেল হইতে পলাতক বন্দী দীনেশ মজুমদার এবং হিজলী বন্দী নিবাস হইতে পলাতক রাজবন্দী নলিনী দাস ঐ বাড়ীতে আছেন। দীনেশ মজুমদার কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্টের প্রাণ নাশের প্রচেষ্টার অভিযোগে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

বাড়ী ঘেরাও করিয়া পুলিস তাঁহাদের আত্মসমর্পণ করিতে বলে। বিপ্লবীদের প্রতিজ্ঞা পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ অসম্ভব—পুলিস বাহিনীর আত্মসমর্পণের দাবীর উত্তরে তাঁহারা গুলী চালাইতে আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ বিপ্লবী ও পুলিস দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। গোয়েন্দা পুলিসের একজন ইনস্পেক্টর বিপ্লবীদের গুলীতে আহত হন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহাদের গুলী নিঃশেষ হইয়া যায়। নলিনী দাসের রিভলভার কিছুক্ষণ গুলী ছোড়ার পরে খারাপ হইয়া যায়। তখন তিনি ঐ বাড়ীর জলের পাইপ বাহিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর ছাদে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করিলে একজন সার্জ্জেণ্ট তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে। পরের দিনের ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজ এই গ্রেপ্তারের বিবরণ প্রকাশের সময়ে তাঁহার অসম সাহসিকতার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিল যে, চার তলার পাইপ বাহিয়া পালাইবার চেষ্টার ফলে যে কোন মুহূর্ত্তে নীচে পড়িয়া তাঁহার জীবন নাশের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সে বিপদ সম্বন্ধে তাঁহার যেন কোন ভ্রুক্ষেপই ছিলনা।

এই সম্পর্কে একটি ষড়যন্ত্র মামলা হয় এবং দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি এবং নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জ্জীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। কিছুদিন পরে আলীপুর জেলে দীনেশ মজুমদারের ফাঁসী হইয়া যায়।

নলিনী দাস

তাঁহার সম্পর্কে ৩০শে আগষ্টের "জনযুদ্ধে" নিরঞ্জন সেন ক্ষুদ্র একটি জীবনী লিখেন আমরা নীচে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ

—১৯২৯ সাল। আমি তখন বরিশাল সহরে। সবেমাত্র ছাড়া পেয়েছি। একটানা জেল জীবনের পর মুক্তির সে কী তীব্র আনন্দ! একদিন একজন বন্ধু এসে জোর করে মাঠে নিয়ে গেল, খুব ভাল একটা খেলা আছে।

অনেকেই বলাবলি করছে—কলেজের ছেলেরা পারবে না, বিরোধী টিমের সাহেবদের বুটের ভয়ে ওদের ধারেও এগোবে না। পাশের একটি ছেলে কিন্তু সে কথার প্রতিবাদ জানালো। জোর গলায়ই বল্ল,—না মশায়, এত সোজা নয়, নলিনী দাস আছে সে ও-সবের তোয়াক্কাই করে না।

নলিনী তখন মাঠে নেমে পড়েছে—আর চতুর্দ্দিক হতে শত শত কণ্ঠে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে! ভাল খেলোয়াড় সাধারণতঃ জনপ্রিয় হয়, কিন্তু একজন যে এত জনপ্রিয় হতে পারে, তখন আমি তা কল্পনাও করতে পারি নি। খেলায় কলেজ টিম জিতেছিল এবং নলিনীর খেলা হয়েছিল অপূর্ব্ব। খেলার শেষে অসংখ্য ছাত্র সেদিন নলিনীকে কাঁধে করে ঘুরে বেড়ায়।

অল্প কয়েকদিন পরের ঘটনা। কলেজের দিকে যেন কি কাজে যাচ্ছিলাম। কলেজের গেটের সামনে একটি লোক আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করছে, আর কয়েকজন তার আশেপাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। কাছে গিয়ে দেখলাম, লোকটা বমি করছে এবং ভয়ানক হাঁপাচ্ছে। সহরে তখন খুব কলেরা। ভয় হল হয়ত কলেরা হয়েছে। তাকে ওভাবে রেখে চলে যাওয়া যায় না। কি করি, কি করি ভাবছি, এমন সময় পাশের একটি দোকানদার বল্ল—মশায়, কলেজ হোষ্টেলে যান, সেখানে নলিনীবাবু আছেন, তাঁকে খবর দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি দৌড়ে কলেজ হোষ্টেলে গেলাম, কিন্তু নলিনীকে পেলাম না। তবে এটা জেনে এলাম যে, হোষ্টেলের ছেলেদের মধ্যে নলিনী মুকুটহীন সম্রাট।

আর একদিন রাত্রে আমার বন্ধু শচীন কর (মেছুয়াবাজার বোমার মামলার অন্যতম নেতা, আজও জেল খাটছেন) ও অন্যান্য ২।১ জনের সাথে আমাদের

ভবিষ্যৎ কার্য্যধারা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। শচীন বল্ল—একটু অপেক্ষা করা যাক্, হরি আসুক, তার কাছ থেকে জানা যাবে কলেজের ছেলেদের ভিতরে আমরা কতখানি এগোতে পেরেছি। জিজ্ঞেস করলাম—হরি কে? শচীন জবাব দিল, হরির ভাল নাম নলিনী দাস, ভোলায় বাড়ী। আমার মনে হয়, আমাদের যারা সব আছে তাদের মধ্যে সেরা এ। আমি খুব আগ্রহের সাথে জানতে চাইলাম, একি সেই খেলোয়াড় নলিনী দাস? শচীন হেসে বল্ল—হঁ্যা, সেই নলিনীই। আমার বুকটা তখন গর্ব্বে ভরে উঠেছে, আমাদের দলে আজ এমন একজন আছে যে বরিশালের সব চাইতে জনপ্রিয় ছেলে।

পরবর্ত্তী জীবনে নলিনীর সাথে আমার ভাল করেই পরিচয় হয়। প্রথম থেকেই বুঝেছি, সে বসে থাকার ছেলে নয়, বসে থাকতে চায় না। জড়তা বলে কোন কিছুই এর ভিতর নেই। কাজ করার অদ্ভুত ইচ্ছা। সহরের সবাই তাকে জানে, চেনে, ভালবাসে। সব ধরণের কাজেই তার অদ্ভুত উদ্যম। কলেজের প্রফেসররা পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তায় বলতেন—নলিনী যদি মন দিয়ে পড়ে, তবে বেশ ভাল ফল করতে পারবে।

গ্রামের 'স্বদেশী' বাড়ীর ছেলে নলিনী। তার কাকা পুরান যুগের বিপ্লবী দলের নেতা, অনেকদিন রাজবন্দী হিসাবে জেল খেটেছেন। বড় ভাই ভোলার নাম-করা কংগ্রেসকর্ম্মী। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে বাড়ীর কাকা ও দাদারা পড়াশুনা ছেড়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বালক নলিনী তখন স্কুলের নীচের ক্লাসে পড়ে। সেই সময় থেকেই তার দেশের কাজে হাতে খড়ি। তখনকার দিনে ভোলা সহরে ও আশপাশের গ্রামগুলিতে যে সব সভা সমিতি হত, সেখানে কংগ্রেস ও খেলাফতের নেতারা ছোট্ট নলিনীকে সাথে করে নিয়ে যেতেন। ফরিদপুরের পীর বাদশা মিঞা, উলানিয়ার ওয়াহেদ রেজা চৌধুরী, ভোলার লাল মিঞা, চুনী সেন, অমূল্য মুখার্জ্জি (এখন মারা গেছেন) প্রভৃতি বালক নলিনীকে অসম্ভব স্নেহ করতেন। নলিনী তার ঐ ছোট বয়সেই ওঁদের কাছ থেকে স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা নেয়।

তখনকার দিনে কংগ্রেস আন্দোলনের শত্রুতা করবার জন্য সরকার থেকে কতকগুলি ভাড়াটিয়া লোক নিযুক্ত হয়। দেশের শত্রু এই দালালগুলিকে বালক

নলিনী মনেপ্রাণে ঘৃণা করত। একদিনের এক ক্ষুদ্র ঘটনায় তা' প্রকাশ হয়ে পড়ে। নলিনী তখন জাতীয় স্কুলের ছাত্র, স্কুলে যাচ্ছিল। পথের মোড়ে ঐ ধরণের একটি দালালকে দেখে নলিনী এগিয়ে গিয়ে বল্ল,—আপনি সরকারের পা-চাটা, দেশের শত্রু, এখনি ও-কাজ ছেড়ে দিন। লোকটা ত ক্ষেপে আগুন, নলিনীকে গালাগালি দিয়ে মারতে যায়। নলিনীও বাঘেব মত ওব উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খানিকক্ষণ মারামারি চলে, তারপর লোকজন এসে পড়াতে লোকটা পালিয়ে যায়। ফ্যাসাদ তখনও মেটে নি। নলিনী ও তার ২।১ জন বন্ধুর নামে কেস হল। ভোলা সহরে ঐ মামলা উপলক্ষে বেশ সাড়া পড়ে যায়। নলিনীব তাতে সাজা হয়েছিল সত্য, কিন্তু খুব অল্প। সেই সাজা বরণ করা উপলক্ষে সেদিন ভোলার কংগ্রেস ও খেলাফত কর্ম্মীরা তাকে ফুলের মালা দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

১৯২৪ সালে অসহযোগ আন্দোলনেব ঢেউ কমে যায়। অনেক ছেলেই আবার সরকারী স্কুলে ফিরে আসে। নলিনীকেও জাতীয় স্কুল ছেড়ে পুরান স্কুলে ফিরে আসতে হয়। ভর্ত্তির সময় নলিনীর চোখে মুখে অসহ্য বেদনাব ছাপ ফুটে বেরোয়। দুদিন তার কান্না থামে না। মাষ্টাররা আত্মীয়স্বজনরা তাকে অনেক বুঝাতে চেষ্টা করে, কিন্তু বালক নলিনী বুঝতে চায় না, সে বলতে থাকে,—স্বরাজ পেলাম না বলেই ত এই সরকারী স্কুলে আবার ফিরে আসতে হল।

এর কিছু দিন পরেই সে সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দেয়। প্রথম সে ও তার ২।১ জন বন্ধু মোটেও সমঝে চলত না, ফলে পুলিসের নজরে পড়ে। স্কুলের হেড মাষ্টারের কাছে পুলিস থেকে খবর যায়। সরকারী স্কুলেব হেড মাষ্টার ত রেগে লাল—আমার স্কুলে স্বদেশীদের আড্ডা ? নলিনী ও তার একটি বন্ধুকে ডেকে নিয়ে শাসায় এবং জিজ্ঞেস করে,—বল্, কার সাথে মিশিস, কি করিস। নলিনী যেন হঠাৎ বোবা হয়ে যায়। প্রাণ থাকৃতে কিছুই বলবে না। হেড মাষ্টারও তাদের দিয়ে বলাবেই। বেত এলো, দশটা করে বেত হ'ল, কিন্তু নির্ব্বাক নলিনীব মুখ দিয়ে সেদিন কোন কথাই বেরোল না। অবশ্য এর পর থেকে নলিনীর সাবধানতা বেড়ে গেল, চলাফেরায় আর কোনরূপ কিছু প্রকাশ পেত না।

১৯২৫-৩০ সালে ভোলাতে যে সব জনহিতকর কাজ হয়েছে, নলিনী ছিল তার প্রত্যেকটি কাজেরই প্রাণ। ভোলা সহরে কলেরা তখন প্রতি বছরই মহামারী

হিসাবে দেখা দিত। নলিনী সেদিনে অগ্রণী হয়ে 'সেবা সমিতি' গড়ে তুলল। ভোলার হিন্দু-মুসলমান সেদিনগুলির দুর্য্যোগে সেই সমিতি হতে দারুণ সাহায্য পেয়েছে। ভোলা ছেড়ে সে যখন বরিশালে যায়, তখনও ভোলাতে যদি কোন মহামারী দেখা দিত, অমনি নলিনীর ডাক পড়ত। ভোলার আবালবৃদ্ধবনিতা তাকে মণে প্রাণে ভালবাসত।

ভোলার যুবকদের কোন লাইব্রেরী বা পাঠাগার ছিল না। নলিনী একাজে এগিয়ে এল। ভোলার 'সাহিত্য মন্দির' সমগ্র জেলায় একটি গর্ব্বের জিনিস। অন্যকে কাজে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা ছিল তার অদ্ভুত। নিজে সব কাজে এগিয়ে যেত বলেই তার সাথে অন্যে চলতে দ্বিধা বোধ করত না। নলিনীর বিপদসঙ্কুল বিপ্লবী জীবনে এটা আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সেই উত্তেজনার দিনগুলিতে প্রতি কাজে সকলের আগে নলিনী, বিপদের মাঝে যেতে হলে নিজে গিয়ে অন্যকে পথ দেখাব, এই ছিল তার মূল মন্ত্র।

নলিনীর এ গুণগুলির পরিচয় এমন ভাবে পেয়েছি বলেই আমরা যখন মেছুয়া বাজার বোমার মামলায় ধরা পড়ি, তখনও হতাশ হইনি, মনে করেছি, আমাদের নলিনী যখন বাইরে আছে, তখন আমাদের আবদ্ধ কাজ এগোবেই। পরে জেনেছি, নলিনী সে বিশ্বাসের পূর্ণ মর্য্যাদা রেখেছে।

১৯২৯ সালে আমরা ধরা পড়ার পর হতেই তার নামে বোমার মামলার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। পুলিশ তাকে ধরার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। নলিনী আত্মগোপন করে আমাদের যা-কিছু ছিল তাই গুছিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় সে ধরা পড়ে। ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলায় সরকার তাকে জড়াবার চেষ্টা করে। না পেরে ডেটিনিউ করে হিজলী ক্যাম্পে পাঠায়।

হিজলী ক্যাম্পে তখন সরকারী কুশাসন চলছিল। জেল কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে ডেটিনিউরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ঝগড়া বিরোধ লেগেই আছে। সামান্য একটা ঘটনা উপলক্ষ করে সরকারী কর্ম্মচারীরা একদিন একটা দারুণ অমানুষিক কাণ্ড করে ফেলে, নিরস্ত্র ডেটিনিউদের উপর বেপরোয়া গুলী চালিয়ে দু' জনকে হত্যা করে ও অনেককে জখম করে। যাঁরা মারা

গেছেন, তাঁদের একজন ছিলেন সন্তোষ মিত্র ও অন্য আর একজন তারকেশ্বর সেন, নলিনীর ছেলেবেলাকার বন্ধু। নলিনী নিজেও সেদিন জখম হয়েছিল। হিজলী ক্যাম্পের সেদিনকার সেই "নিদারুণ ঘটনায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত চঞ্চল হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, বাঙ্গালী জাতির বিক্ষোভের রূপ সেদিন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল কলকাতায় টাউন হলের বিরাট জনসভায়। হিজলীতে বসে নলিনীও সেদিন বন্ধুর মৃত্যুতে শপথ করেছিল—এই অমানুষিক অত্যাচারের সে প্রতিশোধ নেবেই নেবে। তিন মাস পরে সুযোগ পেয়ে সে হিজলী থেকে পালায়।

তারপর সুরু হয় তার দ্বিতীয় বারের অজ্ঞাত বিপ্লবী জীবন। পুলিশের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও পুরস্কারের ঘোষণা এড়িয়ে দিনের পর দিন নলিনী কিভাবে সংগঠন বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করে, তার বিস্তৃত ইতিহাস লেখা এখানে সম্ভব নয়। ১৯৩৩ সালে চন্দননগরের পুলিস কমিশনার কুইন সাহেবের হত্যার পর শোনা যায়, তাকে ও দীনেশ মজুমদারকে পুলিস সন্দেহ করে। তাদের নামে পুরস্কারের মাত্রা বাড়িয়ে ৫০০০৲ টাকা করা হয়। নলিনীর জন্য তখন বরিশালের গ্রামে গ্রামে তল্লাসী হত। কিন্তু কোথাও নলিনীর খোঁজ পাওয়া যেত না। গ্রামের জনসাধারণ তখন নলিনীকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অনেক কিছু করেছে।

১৯৩৩ সালের জুন মাস। সেদিনকার এণ্ডারসনী শাসনের কথা বাঙ্গালী ভুলে যায় নি, ভুলতে পারবেও না। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে একটা বাড়ীর নীচে একদিন অসংখ্য পুলিস ও সার্জ্জেণ্টের জমায়েত দেখা যায়। রাস্তার লোকের মনে তড়িৎ খেলে যায়, কারা এ বাড়ীতে আছে! হঠাৎ গুলীর শব্দ আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে তোলে। পুলিস ও বিপ্লবীদের মধ্যে রীতিমত লড়াই চলেছে। নলিনী চেষ্টা করল, রিভলবার হাতে করেই পুলিসের লাইন ভেদ করবে। এক হাতে উদ্যত রিভলবার নিয়ে চার তলার পাইপ বেয়ে নামার চেষ্টা করে। কিন্তু কোন ফল হয় না, পুলিসের গুলিতে জখম হয়ে ধরা পড়ে যায়। সেদিন একজন বড় পুলিস অফিসারও জখম হয়েছিল। সেই বাড়ী থেকে ধরা পড়ে নলিনী দাস, দীনেশ মজুমদার (ফাঁসী হয়ে গেছে) আর

জগদানন্দ মুখার্জি (গত ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত একটানা জেল খাটছেন)। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারে নলিনী ও জগদানন্দের যাবজ্জীবন জেল হয় ও দীনেশ মজুমদারের ফাঁসীর হুকুম হয়।

নলিনীর পরবর্ত্তী জেল জীবনে আমি তার সাথে কিছু দিন একত্রে আন্দামানে কাটিয়েছি। অসহ্য কষ্টের ভিতর দিয়েও নলিনী একটুও বদলায় নি। সেই অসম সাহস, সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সেই জনপ্রিয়তা সবই বজায় আছে। আন্দামানের কাউকে জিজ্ঞেস করলে সবাই এক বাক্যে বলবে—নলিনীর মত এত প্রিয় তাদের আর কেউ নেই। সকল দলের সকলের মতই এই, এ আমি জোর করে বলতে পারি।

নলিনী জেলে কমিউনিষ্ট হয়েছে। ১৯৩৫ সালের মে দিবসে আন্দামান 'কমিউনিষ্ট কনসলিডেশনের' প্রতিষ্ঠার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়। ঐ দিনে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের এক সভাতে নলিনী তার বন্ধুদের সাথে ঘোষণা করে—"...আমরা আমাদের রক্তাক্ত সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, নিজেদের আত্মসমালোচনা ও বিভিন্ন দেশের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস হতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সন্ত্রাসবাদী পথে স্বাধীনতা আসতে পারে না।..."

নলিনীর জেল জীবনের ১৪ বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে। জেল জীবনের নানারূপ নির্য্যাতনে, অনেক বারের অনশন ধর্ম্মঘট ও বিভিন্ন ধরণের সরকারী জুলুমবাজী নলিনীর স্বাধীনতা স্পৃহাকে এতটুকু কমায় নি। তাই বীর নলিনী ও অন্যান্য সকলের এই বন্দীদশায় আমরা আজ আবার শপথ নিচ্ছি—এই বন্দীদের মুক্ত না করে আমরা থামব না,—কিছুতেই থামব না।

জগদানন্দ মুখার্জ্জী

১৯২৭ সালে ছাত্রজীবনেই জগদানন্দ জাতীয় আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতির কর্ম্মী হিসাবে সেবা কাজের মধ্য দিয়া তিনি ২৪ পরগণা জিলা কংগ্রেসের কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি দুই বার কারাবরণ করেন।

১৯৩৩ সালে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুলী চালনা ও ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং আন্দামানে প্রেরিত হন।

তিনি আর সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করেন না, কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। জেলে তাঁহার প্রায় ১৪ বছর কাটিয়া গিয়াছে। তিনি এখন ঢাকা জেলে আছেন।

গ্র্যাস্‌বী হত্যা প্রচেষ্টা মামলা (ঢাকা)

বিনয় রায়

কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন আর চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ১৯৩০ সাল হইতে বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়াকে গরম করিয়া তুলিয়াছিল।

বিনয় তখন ঢাকা জুবিলী স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র। বিপ্লবী দলের গোপন ও গুরুতর কাজকর্ম্মের সঙ্গে তখনও তিনি ঘনিষ্ঠ হননি। তাই বলিয়া তাঁহার দেশভক্তি নিষ্ক্রিয় ছিল না। কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্কুলে ধর্ম্মঘট ও বে-আইনী সভা সমিতিতে তিনি ছিলেন উৎসাহী কর্ম্মী। দল বাঁধিয়া কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার হইয়া মদের দোকানে পিকেটিং করিতে বিনয় ছিলেন তাঁহার ছাত্রবন্ধুদের নেতা। এজন্য তখন হইতেই তাঁহাকে পুলিসের মারপিটও সহ্য করিতে হইয়াছে।

১৯৩১-এ বিনয় বিপ্লবী দলের গোপন গণ্ডীতে আসিয়াছেন। সে সময়ে তাঁহার উপর কয়েকজন ফেরারী কর্ম্মীদের আস্তানা আগলাবার ভার ছিল। একাজে বিপদসঙ্কুল দায়িত্ব পালনে বিনয় কখনো ফাঁকি দেন নি। ঐ ছোট বয়সেই বুদ্ধি ও স্থৈর্য্য বিনয়ের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। পরবর্ত্তী জীবনে তা আরও বিকশিত হইয়া উঠে।

এ সময়ের একটী ঘটনা। বিপ্লবীদের এক আস্তানায় বিনয় রাত্রে আসিয়া উপস্থিত। সে দিন শহরে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এক

ভদ্রলোক তার মনিবের কয়েক হাজার টাকা সঙ্গে লইয়া যাইতেছিল—এই অনুমান করিয়া কয়েকজন যুবক রিভলবারের সাহায্যে তাহাকে চাপিয়া ধরে এবং আহত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া যায়। ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া বিনয় বলিয়াছিলেন—"এ ঠিক হইতেছে না। ইহাতে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষকেই চটাইয়া দেওয়া হয়।" বৈপ্লবিক কাজের সঙ্গে সাধারণ দেশবাসীর স্বার্থের ও মনের যোগাযোগ—বিনয়ের বলিষ্ঠ দেশপ্রেম সেদিন ঐ সামান্ত কয়েকটি কথার মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়াছিল।

১৯৩২'র মাঝামাঝি। ত্রাসে ও প্রতিহিংসায় দমননীতি নিরীহ নিরপরাধ বাছবিচার না করিয়া ঢাকার বুকে তখন উন্মত্ততার সৃষ্টি করিয়াছে। ঢাকার জনপ্রিয় নেতা অনিল দাস পুলিস হাজতে পুলিসের নির্য্যাতনে নিহত হন। হৃদয়হীন বর্ব্বরতার বিরুদ্ধেই বিপ্লবীদের আক্রোশ ছিল সবচেয়ে বেশী। জীবন দিয়াও তাঁহারা ইহার জবাব দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ঐ সালের জুলাই মাসের এক বিকাল বেলা। ঢাকা গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্ত্তা গ্র্যাস্‌বী সাহেব অফিসের পরে মোটরে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। গাড়ীর ভিতরে দুই জন এবং বাহিরে মোটর সাইকেলে দেহরক্ষী সার্জ্জেণ্ট রিভলবার বাগাইয়া সতর্ক দৃষ্টিতে পথ রক্ষা করিয়া যাইতেছিল। শহরের উত্তর দিকে বড় রাস্তার উপর দিয়াই রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। লেভেল ক্রশিং-এর গেট বন্ধ। মোটর সেখানে থামিয়া গেল। দূরে রেল সিগ্‌ন্যালের পাখা ঠিক খাড়াই আছে। গেট বন্ধের কোন সঙ্গত কারণ ঘটেনি। বন্ধ গেটের পাশেই একটি যুবক বার বার সিগ্রেট ধরাইবার চেষ্টা করিতেছিল। শহরের এই খোলা প্রান্তে তাহার চেষ্টা বার বার বিফল হইতেছিল। গাড়ীর আরোহীদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ।

হঠাৎ গ্র্যাস্‌বীর উপরে আক্রমণ আরম্ভ হইল। পিস্তলের গুলীতে গ্র্যাস্‌বী আহত হইলেন। দেহরক্ষীর দল প্রথমটা হতভম্ব হইয়া যায়, পরে সামলাইয়া লইয়া যুবকটিকেও রিভলবারের সাহায্যে আক্রমণ করে। তাহাদের গুলীতে গুরুতরভাবে জখম হইয়া ঐ স্থানে বিনয় ধরা পড়েন। বহুদিন হাসপাতালে ভুগিয়া তিনি কোনক্রমে রক্ষা পান। তাঁহার দেহ হইতে চারিটি গুলী

কাটিয়া বাহির করা হইয়াছিল কিন্তু একটি গুলী বাহির করা সম্ভব হয় নাই, ভিতরেই রহিয়া গিয়াছে। গুলীর আঘাতে হাতের একটি আঙ্গুল একেবারে অকেজো হইয়া গিয়াছে।

এই ঘটনার দিনকয়েক আগে বাংলা সরকার বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে একটি নূতন উপধারা জুড়িয়া দেন, যার ফলে কেবলমাত্র হত্যা নয়, হত্যা প্রচেষ্টার অপরাধেও ফাঁসীর দণ্ড হইতে পারিবে, এই নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিনয়ের জন্ম ফাঁসীর দড়িই বরাদ্দ ছিল। ঢাকার আদালতে এই নূতন উপধারার সরকারী নোটিস তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। কাজেই বিনয়ের ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য নয়—আইনের এই ফাঁক দিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। তাঁহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কলিকাতা হইতে পরলোকগত দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে ছুটিয়া গিয়াছিলেন বিনয়কে ফাঁসীর হাত হইতে রক্ষা করার জন্ম। বিনয়কে বাঁচাইতে তিনি আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

বন্দীমুক্তির দাবীতে ১৯৩৭ সালে আন্দামানে এবং ১৯৩৯ সালে আলীপুর ও দমদম জেলের সুদীর্ঘ অনশন ধর্ম্মঘটে বিনয় সক্রিয় অংশীদার ছিলেন। ১৯৪২ সালে জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে ঢাকা জেলের প্রাচীর-অভ্যন্তর হইতে যে সব বন্দীরা ফ্যাসিজম ধ্বংসের উদাত্ত আহ্বান দেশবাসীর কাছে পাঠাইয়াছিলেন বিনয় তাঁহাদের অন্ততম। দেশের স্বাধীনতার প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা তাঁহাকে ফ্যাসিজমকে ঘৃণা করিতে শিখাইয়াছে—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে চিরতরে শোষণমুক্ত করিবার মহান ব্রতে উদ্দীপিত করিয়াছে। সন্ত্রাসবাদের পথ ছাড়িয়া গণসংগ্রামের পথে বিনয়ের নূতন কর্ম্মজীবন কারাগারে অপেক্ষমান। সুদীর্ঘ মেয়াদের বোঝা তাঁহার মনে মোটেই দাগ কাটিতে পারে নাই। দেশের মুক্তি আন্দোলনের তীব্রতা আবার তাঁহাকে জেলমুক্ত করিবে এই বিশ্বাসে তিনি বলীয়ান।

বিনয় এখন ঢাকা জেলে। সাধারণ নিয়মানুযায়ী সাজাও তাঁহার ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সাধারণ নিয়ম ইঁহাদের বেলায় খাটেনা। তাই বিনয়ের মুক্তি অনিশ্চিত। বিনয়ের পরিবার আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। তাঁহার বাবা পোষ্টাল

ডিপার্টমেণ্টের বড় চাকুরী করিতেন। বিনয় ধরা পড়িবার কয়েক বছর আগে শারীরিক অসুস্থতার জন্য চাকুরী হইতে অবসর লইয়া বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন পাইতেছিলেন। কিন্তু বিনয়ের জন্য সরকার তাঁহার পেন্সনের ব্যবস্থা বন্ধ করে। হক্ মন্ত্রীমণ্ডলীর আমলে এই বিষয়ে বহু দরবার করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

দেশভক্তি বিনয়ের জীবনের ব্রত। নির্য্যাতন ও দুর্ভোগ তাঁহার কাছে দেশভক্তিরই পুরস্কারস্বরূপ। সে জন্য বিনয় পরোয়া করেন না সত্য, কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্জ্জয় সৈনিক বন্দী বিনয় ও তাঁহার দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরিবারের প্রতি দেশবাসীর তো কর্ত্তব্য আছে ?

বার্জ্জ হত্যা মামলা (মেদিনীপুর)

১৯৩০ সালে মেদিনীপুরে গণ-আন্দোলন যেমন চরমে উঠিয়াছিল, আমলাতান্ত্রিক অত্যাচারও তখন মাত্রা ছাড়াইয়া মেদিনীপুরে এক তাণ্ডবের সৃষ্টি করিয়াছিল। ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের স্বদেশপ্রীতি সমূলে উচ্ছেদ করিবার যতপ্রকার ব্যবস্থা সম্ভব তাহা করা হইয়াছিল। স্কুল, কলেজ, ছাত্রাবাস প্রভৃতি স্থানে আকস্মিক খানাতল্লাস চলিতে থাকে। তাহাদের স্বাধীন গতিবিধি, খেলাধুলা প্রভৃতিতে বাধা জন্মাইয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবন দুর্ব্বিসহ করিয়া তোলা হয়। সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি যাঁহারা সহানুভূতিশীল, তাঁহাদের বাড়ীঘর বাস্তুভিটা পিটুনী পুলিসের জন্য ছাড়িয়া দিয়া গৃহহীন হইয়া দিন কাটাইতে হয়। স্বাধীনতার উপাসক ছাত্র ও যুবকদের মনে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ-সংকল্প দৃঢ় হইয়া উঠে। ফলে মেদিনীপুরের পরপর তিনজন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ প্যাডি, মিঃ ডগ্‌লাস ও মিঃ বার্জ্জ পিস্তলের গুলীতে নিহত হন।

১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মেদিনীপুরের পুলিস গ্রাউণ্ডে মিঃ বার্জ্জ অনাথ বন্ধু পাঞ্জা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত নামক দুইটি ছাত্রের হাতে নিহত হন। খেলার মাঠে উপস্থিত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের দেহরক্ষীদের গুলীতে এই দুইজন বীর যুবক সেখানেই প্রাণ দেন।

পরে এই হত্যা সম্পর্কে একটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করিয়া প্রথম দফায় তিন জন যুবককে ফাঁসী ও চারজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দফায় আর একজন যুবককে যাবজ্জীন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্ম্মলজীবন ঘোষ—এই তিন জনের ফাঁসী হইয়া যায়। যাঁহাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে দুইজন—সনাতন রায় এবং নন্দদুলাল সিংহ—অসুস্থতার জন্য মুক্তি পান। শান্তিগোপাল সেন, সুকুমার সেন ও কামাখ্যা ঘোষ—এই তিনজন এখনও কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন।

শান্তি সেনগুপ্ত

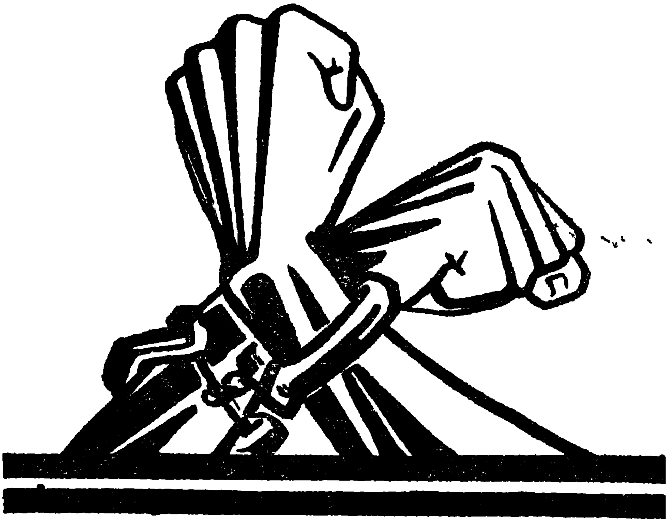
ইনি ছাত্রজীবনেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। মেদিনীপুর ও অন্যান্য স্থানে বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে ইঁহার নামে বহু পূর্ব্বেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়। কলিকাতায় ধৃত হইয়া বার্জ্জ হত্যা মামলার দ্বিতীয় দফা বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। জেলে তাঁহার প্রায় ১৩ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও কারাভোগ করিতেছেন। ইনি বর্ত্তমানে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন।

সুকুমার সেনগুপ্ত

ছাত্র অবস্থায় ইনি বার্জ্জ হত্যা মামলা সম্পর্কে ধৃত হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে ১৩ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও এখনও তিনি কারাভোগ করিতেছেন। ইনি সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন, কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ঢাকা জেল হইতে যে বন্দীরা ফ্যাশিষ্ট বিরোধী বিবৃতি দিয়াছিলেন—ইনি তাঁহাদের অন্যতম।

কামাখ্যা ঘোষ

ছাত্র অবস্থায় অতি তরুণ বয়সে বার্জ্জ হত্যা মামলায় ধৃত হইয়া তাঁহারও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের হুকুম হয়। তাঁহার ১৩ বৎসর দণ্ডভোগ শেষ হইয়াছে কিন্তু মুক্তি না পাইয়া তিনি এখনও কারাভোগ করিতেছেন। তিনি সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন, কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। জেল হইতে বন্দীদের প্রেরিত ফ্যাশিষ্ট বিরোধী বিবৃতির তিনিও একজন স্বাক্ষরকারী।



আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৩৩ সালে বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ধরপাকড় ও খানাতল্লাসের পর কলিকাতায় এক বিশেষ আদালতে প্রায় ৩০।৩২ জন যুবকের বিরুদ্ধে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা নামে একটি মামলা সুরু হয়।

যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাব প্রদেশেও এই যুবকগণ তাঁহাদের গোপন সংগঠন এবং সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযোগ করা হয়। সীতানাথ দে বাংলা দলের সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। প্রভাত চক্রবর্ত্তী এই দলের নেতা ছিলেন। ইঁহারা বিভিন্ন উপায়ে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া এবং নানাবিধ বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া একসঙ্গে বহু স্থানে সন্ত্রাসবাদী অভিযানের মধ্য দিয়া বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কলিকাতা, বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এই

উদ্দেশ্যে বিপ্লবী যুবকদের বহু ঘাঁটি তৈয়ার করিয়াছিলেন। প্রভাত চক্রবর্ত্তী, জীতেন গুপ্ত, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত সুরেন, ধর চৌধুরী ও ১২ জন যুবকের বিশেষ আদালতে দীর্ঘ মেয়াদের কঠোর কারাদণ্ড হয়। শ্রীযুত প্রভাত চক্রবর্ত্তী, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, জীতেন গুপ্ত ও সীতানাথ দে'র যাবজ্জীবন এবং অন্যান্যদের ৭ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছিল। শেষোক্ত বন্দীদের নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও তাঁহারা মুক্তির সাথে সাথেই জেলের দরজায় আবার নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে গ্রেপ্তার হইয়া আটক ছিলেন, মাত্র কিছুদিন হয় মুক্তি পাইয়াছেন। কিন্তু যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত ৪ জন নেতা এখনও মুক্তি পান নাই।

এই মামলার বীর বন্দীদের জীবনী

প্রভাত চক্রবর্ত্তী

প্রভাত চক্রবর্ত্তী চাঁদপুরের এক জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় ছোটবেলা হইতেই স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ছাত্রজীবনে রোগীর শুশ্রূষা, শবদাহ, বন্যাপীড়িতের সাহায্য, যুবকদের শরীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য ক্লাব ও আখড়া স্থাপন ইত্যাদি কার্য্যে খুবই উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার স্কুল জীবনের একটি ঘটনা: স্কুলে সরকারী আদেশে ছাত্রদের বৃটিশ পতাকা কিনিতে এবং দরবার দিবসের শোভাযাত্রায় যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। কিশোর প্রভাত আপত্তি তোলেন— বিদেশীর কাছে মাথা নত করিব না। তাঁহার বিদ্রোহী মনের প্রথম আত্মপ্রকাশ হয় এইভাবে। অন্যান্য অনেক বিদ্রোহী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেদের মত ১৯১৭ সালে তিনিও গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনে উৎসাহভরে নির্ভীকচিত্তে যোগ দেন। ১৯২১ সালে কলেজ বর্জন করিয়া অনেক ছাত্রসহ তিনি বাহির হইয়া আসেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেন। বিখ্যাত কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম নেতা যোগেশ চ্যাটার্জ্জী ও অন্যদের সহিত একত্রে কুমিল্লা ন্যাশনাল স্কুল ও লেবার হাউসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ত্রিপুরা জিলা কংগ্রেস কমিটির সংগঠক হিসাবে তিনি জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলনের কাজে ঘুরিয়া বেড়ান। চাঁদপুরে চা-বাগানের মজুরদের প্রতি

অত্যাচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কমিটি যে রিলিফের ব্যবস্থা করেন, তিনি ছিলেন তাহার একজন অক্লান্ত কর্ম্মী ও নেতা। তিনি কুমিল্লা যুব সমিতির সংগঠক ছিলেন। ১৯২৪ সালের অক্টোবরে পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে। তিনি তখন গা-ঢাকা দিয়া গুপ্ত সমিতির কাজ করেন এবং ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত আত্মগোপন করিয়া থাকেন। জিলা কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক হিসাবে তিনি ১৯২৯ সালে .জেলার বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করেন এবং কৃতকার্য্য হন। ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হইতে ফিরিবার পথে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং বিনা বিচারে বন্দী হইয়া থাকেন।

দুই বৎসর কারারুদ্ধ থাকার পর তিনি এক গ্রামে অন্তরীণ হন এবং সেখান হইতে পলায়ন করেন। ১৯৩২ সালে ধরা পড়িয়া অস্ত্র আইনে ৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেল খাটিবার সময় আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁহাকে আবার আসামী করা হয়। স্পেশাল ট্রাইবিউনালের বিচারে ১৯৩৫ সালে দলের নেতা হিসাবে তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আলিপুর জেলে তাঁহাকে হাতকড়ী-ডাণ্ডাবেরী ইত্যাদি নানাবিধ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়। ১৯৩৭ সালে আন্দামানে অনশন করার পর অন্যান্য সকল রাজনৈতিক বন্দীর সাথে তাঁহাকেও ভারতের কারাগারে ফিরাইয়া আনা হয়। জেল হইতে মহাত্মা গান্ধীর মারফত দেশবাসীকে তিনি স্পষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন—সন্ত্রাসবাদে তাঁহার বিশ্বাস নাই। ১৯৪২ সালে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া যে বন্দীরা বিবৃতি দেন তিনি তাহাদের অন্যতম। তিনি প্রায় ১৫ বৎসর জেল খাটিয়াছেন, এখনও জেলে আছেন এবং নানা রোগে কষ্ট পাইতেছেন। বর্ত্তমানে তিনি কমিউনিজম মতবাদে পূর্ণ বিশ্বাসী।

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত

পূর্ণনন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি ছাত্রজীবনেই জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি বলে তিনি অল্প বয়সেই ঢাকা জিলা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। তিনি ১৯২৪-২৮ সাল পর্য্যন্ত বিনা বিচারে আটক থাকেন। ১৯৩০ সালে আবার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হয়। ১৯৩৫ সালে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন

দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। এই মামলায় বিচারাধীন থাকা অবস্থায় অন্য তিনি জন সহকর্ম্মীর সহিত আলীপুর জেল হইতে পলায়ন করেন এবং বাহিরে আসিয়াই আবার সন্ত্রাসবাদী দল সংগঠন করিতে থাকেন। এই অবস্থায় কলিকাতার নিকটবর্ত্তী টিটাগড়ে ধরা পড়েন। তাঁহাকে টিটাগড় ষড়যন্ত্র নামক আর একটি মামালায় জড়িত করিয়া দ্বিতীয়বার তাঁহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। প্রেসীডেন্সী জেলে তাহাকে নির্জ্জন কারাকক্ষে বেড়ী দিয়া রাখা হইত তখন তাহার স্বাস্থ্যও খুব খারাপ হইয়া যায়। হৃদরোগ ও অর্শে ভুগিতে ভুগিতে এখন তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জেলে থাকিতে ইহার প্রতিকারের আর কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি ঢাকা জেলে আছেন।

সীতানাথ দে

সীতানাথ ছোট বয়স হইতেই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সন্ত্রাসবাদী বলিয়া ১৯১৬ সালে তিনি অন্তরীণ হন। ১৯২১ সাল হইতে তিনি কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যে এবং সেবা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। পরে তিনি গোপনে সাধুর বেশে যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে গিয়া সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ সংগঠন করিতেন। প্রায় ৯ বৎসর পরে ১৯৩৩ সালে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি ধরা পড়েন। মাদ্রাজের উটকামণ্ড বোমার মামলায় এবং বেনারসের একটি মামলায়ও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারাধীন থাকার সময়ে ১৯৩৪ সালে তিনি আলিপুর জেল হইতে পলায়ন করেন। পরে ধরা পড়িয়া ঐ মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এখন তিনি বৃদ্ধ হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্যে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তিনি সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন। ধর্ম্মভাবাপন্ন লোক বলিয়া দলের মধ্যে তিনি ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত। মামলায়ও তাহাকে ব্রহ্মচারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

জীতেন গুপ্ত

তিনি ঢাকা জিলায় একজন বিশিষ্ট যুবনেতা ছিলেন। ১৯৩০ সালে বিনা বিচারে আটক হইয়া বক্সা বন্দী নিবাসে প্রেরিত হন এবং সেখান হইতে পলায়ন করেন। পরে ১৯৩৫ সালে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হইয়া আন্দামানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। জেলে তাঁহার প্রায় ১২ বছর কাটিয়া গিয়াছে।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৩৩-৩৫ সালে বাংলার যে সকল উৎসাহী স্বদেশপ্রেমিক কর্ম্মী আর একবার সন্ত্রাসবাদী অভিযান সুরু করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই একটি বিশিষ্ট সমিতির অন্তর্ভুক্ত যুবকদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ করা হয়। টিটাগড় ষড়যন্ত্র এই ধরণের একটি মামলা।

১৯৩৫ সালে বিভিন্ন স্থানের প্রায় ২২ জন যুবক এই মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। দেশে তখন সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ হ্রাস পাইয়াছে, অনেকেই সন্ত্রাসবাদী পন্থা ত্যাগ করিয়া নূতন কর্ম্মপন্থার ভিত্তিতে সংগঠনে ব্রতী হওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে এই কয়েকজন যুবকের উপর এই ষড়যন্ত্র মামলা চাপাইয়া দেওয়া হয়। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম নেতা বিচারাধীন বন্দী জেল পলাতক পুর্ণানন্দ দাশগুপ্ত এই ষড়যন্ত্র মামলারও নেতা ছিলেন। পুর্ণানন্দবাবুকে এই মামলায় দ্বিতীয়বার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং প্রফুল্ল সেন ও অন্যান্য অনেককে ৪ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ডিত করা হইয়াছিল। প্রফুল্ল সেন এখনও কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন।

প্রফুল্ল সেন

ইনি কুমিল্লার একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন। ১৯৩৬ সালে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে তাঁহার প্রায় ১১ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তিনি অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছেন।

হিলি ষড়যন্ত্র মামলা (দিনাজপুর)

১৯৩৩ সালে দিনাজপুর জেলার হিলি রেল ষ্টেশনে সরকারী ডাক লুঠ হয়। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চালাইবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে বিপ্লবীরা এই পন্থার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেন।

এই মামলা সম্পর্কে জরুরী আদালতে প্রায় ১০ জন যুবক দণ্ডিত হন। হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, সত্যব্রত চক্রবর্ত্তী ও সরোজ বসু এই ৪ জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, অন্যান্যদের ৫ বৎসর হইতে যাবজ্জীবন কঠোর কারাবাসের হুকুম হয়। পরে হাইকোর্টের বিচারে ঐ দণ্ড কমিয়া হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য ও প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং সত্য চক্রবর্ত্তী, সরোজ বসু ও প্রফুল্ল সান্যালের ১০ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। শেষোক্ত তিন জন পূর্ণ দণ্ডভোগের পরেও আবার সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে প্রায় ৩ বৎসর কাল বিনাবিচারে আটক ছিলেন। সবেমাত্র তাঁহারা মুক্তি পাইয়াছেন। প্রথমোক্ত দুই জন এখনও কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রায় ১৩ বৎসর দণ্ডভোগ শেষ হইয়াছে।

হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য

১৯২৮-২৯ সালের কথা। দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার দক্ষিণ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের সাহায্যের জন্য শহরের পাড়ায়-পাড়ায় যুবক ও ছাত্রদের দল অর্থ সংগ্রহের কাজে লাগিয়া গিয়াছে। হৃষিকেশ ছিলেন এই রিলিফের একজন উৎসাহী কর্ম্মী। তাঁহার বয়স তখন মাত্র ১৪ বৎসর। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণের সেবার ভিতর দিয়াই হৃষিকেশের কর্ম্মজীবন সুরু হইয়াছিল।

১৯৩০ সালের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাংলা দেশ জুড়িয়া এক নব উদ্দীপনায় যে ছাত্র আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল, হৃষিকেশ সেই আন্দোলনকে সংগঠিত করার দায়িত্ব লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দিনাজপুর জেলার ছাত্র আন্দোলন গড়িয়া তোলার কাজে তাঁহার দান ছিল অশেষ। অল্পবয়স্ক হইলেও তাঁহার স্থির বুদ্ধি, শান্ত সংযত ব্যবহার, আদর্শের প্রতি অচল নিষ্ঠা এবং দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লক্ষ্যে পৌঁছিবার দৃঢ় সংকল্প তাঁহাকে ঐ বয়সেই সকলের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। বয়সে ছোট এই ছাত্র কর্ম্মীর নির্দ্দেশ বয়সে বড় ছেলেরাও বিনা দ্বিধায় পালন করিত।

এই ভাবে জন সেবা, ছাত্র আন্দোলন, ব্যায়াম সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের দায়িত্বের সাথে সাথে চলতি গুপ্ত আন্দোলনের সহিতও হৃষিকেশ শীঘ্রই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়েন। পরে হিলি ষ্টেশন ডাকাতি ও ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন।

সাত্ত্বিক ও রক্ষণশীল পিতার তিরস্কার, শাসন এমনকি প্রহার এবং পুলিসের রক্ত-চক্ষু ও লাঞ্ছনা উপেক্ষা করিয়া এই কিশোর বালকের যে দেশপ্রেম নিরন্ন জনগণের সেবা ও ছাত্র আন্দোলনের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইয়াছিল এবং ক্রমে গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনে পরিণতি লাভ করিয়াছিল পরবর্ত্তীকালে কারাজীবনে তাহা সুস্পষ্ট আকার পাইল। তিনি জেলে সন্ত্রাসবাদীর পথ পরিত্যাগ করিয়া কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। আন্দামানে বন্দী থাকার সময়ে তিনি এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

কারা প্রাচীরের অন্তরালে তাঁহার দীর্ঘ তেরো বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। উদগ্র দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন, যে-দিন আবার দেশবাসীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন।

প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

কিশোর বয়স হইতেই নানারূপ জনহিতকর কাজের মধ্য দিয়া প্রাণকৃষ্ণের কর্ম্মজীবন সুরু হয়। যুব আন্দোলনের তিনি একজন খ্যাতনামা কর্ম্মী ছিলেন।

১৯৩২ সালে অস্ত্র আইনের এক মামলায় তাঁহার ৭ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল। ঐ সময় এক জেল হইতে অন্য জেলে স্থানান্তরিত করার পথে তিনি প্রহরী পুলিশদলের চক্ষু এড়াইয়া পলায়ন করেন। ১৯৩৩ সালে পুনরায় হিলি ষ্টেশন ডাকাতি মামলায় প্রথমে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, পরে উহা কমাইয়া তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

জেলে তাঁহার প্রায় ১৩ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু তিনি এখনও মুক্তি পান নাই।

চরমুগরিয়া ডাক-লুঠের মামলা (ফরিদপুর)

১৯৩১ সালে ফরিদপুর জেলার চরমুগরিয়া নামক স্থানে একটি ডাক লুঠ হয়। পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের সহায়তায় যাহারা বিপ্লবীদের ধরাইয়া দিবার জন্য তাঁহাদের পিছনে ধাওয়া করে, তাহাদের সহিত এক সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলে পুলিস পক্ষের একজন লোক নিহত হয়।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া একটি মামলা দায়ের হয়। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য নামক একজন যুবকের ফাঁসী এবং সুরেন কর নামে একজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের বরিশাল জেলে ফাঁসী হইয়া হইয়া যায়।

সুরেন কর

সুরেন কর যুবক বয়সেই কংগ্রেসকর্ম্মী হিসাবে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন এবং পরে মাদারীপুরের একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা হিসাবে খ্যাত হন। তিনি ১৯২৪ হইতে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি আন্দামানে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সেখানে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাঁহাকে বাংলায় ফিরাইয়া আনিয়া চিকিৎসার জন্য রাঁচী পাঠান হইয়াছিল। সেখান হইতে কিছুটা ভাল হইলে তাঁহাকে পুনরায় জেলে ফিরাইয়া আনিয়া কয়েদ খাটান হইতে থাকে।

জেলে তাঁহার ১৬ বছর কাটিয়া গিয়াছে। তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ মাঝে মাঝে দেখা যায়। এখনও পর্য্যন্ত তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই।

আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট মামলা (কলিকাতা)

সুরেশ দাস

১৯৩১ সালে কলিকাতার আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীটে বিপ্লবীদের দ্বারা একটি ডাকাতি সংগঠিত হইয়াছিল। ঐ সম্পর্কে ফরিদপুর জিলার সুরেশ দাস নামক এক যুবককে

গ্রেপ্তার করিয়া বিশেষ আদালতের বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

সুরেশ দাস ফরিদপুরের একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন। দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তাঁহাকে ১৯৩২ সালে আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছিল, ১৯৩৮ সালে তাঁহাকে বাংলা দেশে ফিরাইয়া আনা হয়। জেলে তাঁহার প্রায় ১৬ বছর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও মুক্তি পান নাই। তিনি অজীর্ণ ও হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছেন।

কুমিল্লা গুপ্তচর হত্যার ষড়যন্ত্র ও ইটাখোলা (আসাম) ট্রেণ-লুঠ মামলা

বিরাজ দেব

১৯৩২ সালে কুমিল্লা জেলার কালিগঞ্জ নামক স্থানে এক গুপ্তচর হত্যা প্রচেষ্টার জন্য একটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করিয়া জরুরী আদালতে বিরাজ দেবকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

আসাম প্রদেশের ইটাখোলা নামক রেল ষ্টেশনে এক ডাকাতি মামলায়ও তাঁহার দ্বিতীবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ফলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের জরুরী আইনে তাঁহাকে ৪৫ বৎসর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৩৪ সালে তাঁহাকে আন্দামানে পাঠান হইয়াছিল এবং পরে ১৯৩৮ সালে বাংলা দেশে ফিরাইয়া আনা হয়।

দেশপ্রেমের পুরস্কার হিসাবে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহাকে এই দীর্ঘ মেয়াদ বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। তিনি সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন, কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। জেলে তাঁহার প্রায় ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ঢাকা গুপ্তচর হত্যা মামলা

অমূল্য রায়

১৯৩৫ সালে ঢাকা শহরে হীরালাল চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্যক্তিকে পুলিসের গুপ্তচর সন্দেহে হত্যা করা হয়। এই মামলায় অমূল্য রায়ের প্রথমে মৃত্যুদণ্ড হয় পরে উহা কমিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইয়াছিল।

১৯৩০ সালে ইনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ও পরিবারের অন্যান্য অনেকে কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন এবং আইন অমান্য আন্দোলনে কাবাবরণ করেন।

১৯৩৬ সালে তাঁহাকে আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সেখানে তিনি কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

ফরিদপুর গোয়েন্দা পুলিস-হত্যা মামলা

১৯৩৫ সালের জুন মাসে ফরিদপুব জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া—মদনপুর গ্রামের গোয়েন্দা পুলিস কালিপদ ভট্টাচার্য্যকে ইউনিয়ন বোর্ড অফিস হইতে ফিরিবার পথে ছোরার দ্বারা আক্রমণ করা হয়। এই সম্পর্কে আশু ভরদ্বাজ ও অমূল্য চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল।

আশু ভরদ্বাজ

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় আশু স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ঐ সময়ে হইতেই তিনি কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। স্থানীয় ছাত্র সংগঠন ও পল্লী উন্নয়নের কাজে আশু সকলের অগ্রণী ছিলেন। শীঘ্রই তিনি পুলিসের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া যান।

কিছুদিনের মধ্যে তিনি গোয়েন্দা পুলিশ হত্যা মামলায় কারাদণ্ডিত হন। জেলে তাঁহার মতবাদের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁহার মেয়াদের প্রায় ১২ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

অমূল্য চৌধুরী

অমূল্য চৌধুরী ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন।

এই গোয়েন্দা হত্যা মামলায় তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হওয়ার পরে তিনি ২ বৎসর পলাতক ছিলেন। ১৯৩৭ সালে ধৃত হইয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

দিনাজপুর ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৩৪ সালে দিনাজপুরে বহু ডাকাতি ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ সম্পর্কে একটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। জরুরী আদালতের বিচারে দশ জন যুবকের ৫ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই কার্য্যকলাপের নেতা হিসাবে নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ও দীনেশ দাসের যথাক্রমে ১৫ ও ১২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তাঁহাদিগকে পরে আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

দীনেশ দাস

দীনেশ দাস পূর্ণ ১২ বৎসর দণ্ড ভোগের পরেও মুক্তি পান নাই। কারাদণ্ড শেষে মুক্তি হওয়ার পরে তাঁহাকে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আটক রাখা হইয়াছে।

নরেন ঘোষ

নরেন ঘোষ এখনও দণ্ড ভোগ করিতেছেন। তাঁহাকে প্রথম দফায় ডাকাতি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১০ বৎসর এবং বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী বিধি অনুযায়ী অন্তরীণ আইন ভঙ্গের অপরাধে ৫ বৎসর কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ইঁহারা উভয়েই সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন। কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

গভর্ণর হত্যার ষড়যন্ত্র (লেবং—দার্জিলিং)

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আইরিশ বিপ্লববাদীদের বিরুদ্ধে "কুখ্যাত ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান" দমননীতির প্রবর্ত্তক সার জন এণ্ডারসন তখন বাংলার গভর্ণর। বাংলার বিপ্লবীদের সায়েস্তা করার জন্য এই জাঁদরেল সাম্রাজ্যবাদীকে বিলাত হইতে বাংলার গভর্ণর করিয়া পাঠান হইয়াছিল।

ইঁহারই শাসনাধীনে বাংলার তথাকথিত আইন সভার মারফৎ নূতন নূতন জরুরী আইন, অর্ডিন্যাস প্রভৃতি পাশ করিয়া বাংলার যুবশক্তিকে, বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনাকে নির্ম্মূল করার চেষ্টা চলিতেছিল।

জাতীয় অপমানে অভিভূত বাঙ্গালী যুবকদের একটি বিপ্লবীদলের তাই লক্ষ্য হইল অত্যাচারের এই প্রধান প্রতীককে আঘাত করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে। ইহারই ফলে দার্জিলিং এর লেবং নামক স্থানে ১৯৩৪ সালে সার জন এণ্ডারসনের উপর রিভলভারের আক্রমণ হয়। ঘটনা স্থলে দুইটী যুবক ধরা পড়েন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতায় গভর্ণর হত্যা ষড়যন্ত্র মামলা হয়। ভবানী ভট্টাচার্য্য নামে একটি যুবকের ফাঁসী হইয়া যায়। এই মামলা সম্পর্কে দণ্ডিত মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, মধু ব্যানার্জী ও সুকুমার ঘোষ এখনও জেলে রহিয়াছেন। -

মনোরঞ্জন ব্যানার্জী

তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং পরে আন্দামানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইনি ঢাকার বিশিষ্ট ছাত্র কর্ম্মী ছিলেন। ছাত্র জীবনেই তিনি এই মামলা সম্পর্কে ধৃত হন।

মধু ব্যানার্জী

ইনি ছাত্র ও যুব আন্দোনের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। এই ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আন্দামানে প্রেরিত হন। পরে উহা কমিয়া ১০ বৎসর হইয়াছিল।

ইনি আর সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন। জেলে কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ঢাকা জেল হইতে ১৯৪২ সালে যে সব রাজনৈতিক বন্দী ফ্যাশিষ্ট বিরোধী আহ্বান জানাইয়া ঐতিহাসিক বিবৃতি দিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

১০ বৎসর পূর্ণ দণ্ডভোগের পরও তিনি মুক্তি পান নাই। ১৯৪২ সালে কয়েদ-মুক্তি হওয়ার পরে আবার জেলের দরজায় তাঁহাকে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে।

সুকুমার ঘোষ

তিনি ছাত্র ও যুব আন্দোলনে বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। ছাত্র জীবনেই তিনি এই মামলা সম্পর্কে ধৃত হন। ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আন্দামানে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। পরে দণ্ড কমিয়া ১০ বৎসর হয়।

পূর্ণ দণ্ডভোগের পরেও ইনি মুক্তি পান নাই। ১৯৪২ সালে পুনরায় জেলের দরজায় ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হইয়া আটক আছেন।

দাসপুর দারোগা হত্যা মামলা (মেদিনীপুর)

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে মেদিনীপুরের জনসাধারণ এক অপূর্ব্ব সাড়া দিয়াছিল।

ঐ সময় দাসপুর নামক স্থানে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসৈনিকরা স্থানীয় জনসাধারণের নিকট কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিতেছিলেন। পুলিস কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের উপর বলপ্রয়োগ করে, ইহাতে সমবেত জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে পুলিসের হাত হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করে। জনতা ও পুলিসের সংঘর্ষে উভয় পক্ষে হতাহত হয়। পুলিস দলের একজন দারোগার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না।

সরকারের তরফ হইতে ইহা সন্দেহ করা হয় যে, ঐ দারোগাকে হত্যা করিয়া তাহার দেহ গুম করিয়া ফেলা হইয়াছে।

উপস্থিত কংগ্রেস স্বেচ্ছাসৈনিকদের নেতা কানন গোস্বামী ও তাঁহার আর তিনজন সহকর্ম্মীকে ঐ ঘটনায় জড়িত করিয়া দাসপুর দারোগা হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। বিচারে তাঁহাদের ৪ জনের যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হইয়াছিল। আজও ইঁহারা জেলে রহিয়াছেন।

কানন গোস্বামী

ছোট বয়স হইতেই তিনি কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁহার সংগঠন শক্তি এবং কংগ্রেসের কাজে নিষ্ঠার ফলে তিনি শীঘ্রই স্থানীয় অধিবাসীদের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে দাসপুর নামক স্থানে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারের সময় পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হন। এই গ্রেপ্তারের ফলে যে হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল তাহাতে তাঁহাকে নেতা হিসাবে জড়াইয়া দণ্ডিত করা হয়। তিনি কংগ্রেস সেবক সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। পরে জেলে কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন।

শীতল ভট্টাচার্য্য, ভূতনাথ মান্না, বিনোদ বেরা

ইঁহারা সকলেই মেদিনীপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী ছিলেন। কংগ্রেসের ডাকে ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে ইঁহারা ঝাঁপাইয়া পড়েন। কানন গোস্বামীর সহিত দাসপুর দারোগা হত্যা মামলা সম্পর্কে ইঁহাদেরও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এখনও তাঁহারা ঐ দণ্ড ভোগ করিতেছেন।

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩২ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে আইন অমান্য আন্দোলনের সমস্ত বন্দীর যখন মুক্তি হইয়াছিল, তখন ইঁহাদের কথা বাদ দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরেও ইঁহাদের মুক্তির প্রশ্নকে উপেক্ষা করা হয়। এমনকি আজও পর্য্যন্ত উক্ত ৩ জন বন্দীকে রাজনৈতিক বন্দী বলিয়াও গণ্য করা হয় না।

রংপুর ষড়যন্ত্র মামলা

হেম বক্‌সী

১৯৩৩ সালে রংপুরে এক জরুরী আদালতের বিচারে রংপুর ডাকাতির ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের অভিযোগে হেম বক্সী ও অন্যান্য কয়েকজন যুবক দণ্ডিত হন। নেতা হিসাবে তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল।

হেম বক্‌সী রংপুর জেলার জনপ্রিয় নেতা হিসাবে হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছেই সমাদৃত ছিলেন। এই জেলায় প্রত্যেকটি জনহিতকর কাজের সহিত তাঁহার নাম জড়িত। তাঁহার বাসস্থান গাইবাঁধা। এই শহরের অনেকগুলি ব্যায়াম সমিতির তিনি প্রেসিডেণ্ট এবং ওখানকার "তিলক স্মৃতি লাইব্রেরীর" প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

তিনি ছাত্র ও যুব-আন্দোলনের সংগঠক এবং রিলিফ কাজে অগ্রণী ছিলেন। ১৯২১ সালে স্কুল ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। এই সময়ে সেজন্য তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়।

১৯২৩ সালে উত্তরবঙ্গে বন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনগণের সেবায় তিনি ছিলেন সবার পুরোভাগে। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের সভাপতিত্বে "উত্তরবঙ্গ রিলিফ কমিটি" নামে যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল তিনি ইহার বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। ১৯২৮ সাল হইতে তিনি গাইবাঁধা মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁহার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হয়। ঐ টাকা আদায়ের উপলক্ষে তাঁহাদের ঘরের ছাউনির টিন ও অন্যান্য আসবাবপত্র পুলিস ক্রোক করিয়া লইয়া যায়।

১৯৩৪ সালে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি আন্দামানে প্রেরিত হন। সেখানে তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদের পরিবর্ত্তন হয়, তিনি কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন।

তাঁহার মেয়াদের ১৪ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তথাপি তিনি মুক্তি পান নাই।

বাথুয়া ষড়যন্ত্র মামলা (চট্টগ্রাম)

১৯৩৪ সালে চট্টগ্রামে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রবলতা কমিয়া আসে। কিন্তু চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুবকদের প্রতি কর্তৃপক্ষের কড়া নজর বজায় থাকে। ঐ সময় চট্টগ্রাম জিলার বাথুয়া নামক স্থানে একটি ডাকাতি হয়। পুলিশ কিছু দিনের মধ্যে কয়েকজন পলাতক বিপ্লবী ও গুপ্ত আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট সন্দেহভাজন ছাত্র ও যুবককে ঐ ডাকাতি ও ষড়যন্ত্র প্রভৃতির দায়ে অভিযুক্ত করিয়া এক মামলা দায়ের করে। জরুরী আদালতের বিচারে বার জন যুবকের সাত বৎসর হইতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

ঐ মামলার যে দুই জন বন্দী এখনও কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন তাঁহাদের নাম মোক্ষদা চক্রবর্ত্তী ও প্রিয়দা চক্রবর্ত্তী। ইঁহারা দুই সহোদর ভাই। ইঁহারা চট্টগ্রাম জিলা কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক যশোদা চক্রবর্ত্তীর ছোট ভাই। তাঁহাদের দুই জনেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এবং তাঁহারা আন্দামানে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

মোক্ষদা চক্রবর্ত্তী

ছাত্র জীবনে তিনি প্রথমে গ্রাম উন্নয়ন আন্দোলনে যোগ দেন। নিজ জিলায় তিনি কৃষকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় এবং গরীব জনসাধারণের ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করিয়া তাহাদের শিক্ষকতা করেন।

কৈশোরের জনসেবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে পরিণত বয়সে বৃহত্তর জাতীয় অন্দোলনে টানিয়া আনে। চট্টগ্রাম জিলার ছাত্র ও যুব-আন্দোলনের তিনি একজন বিশিষ্ট সংগঠক ছিলেন। ১৯৩৩ সালে কংগ্রেস কর্ম্মী হিসাবে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন।

ইনি আর সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন, কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ঢাকা জেলে হইত বন্দীরা ১৯৪২ সালে ফ্যাশিস্ট-বিরোধী যুদ্ধ সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তিনি তাহার একজন স্বাক্ষরকারী। তাঁহার মেয়াদের প্রায় ১৩ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কারারুদ্ধ অবস্থায় এখন তিনি দুরন্ত হাঁপানি রোগে আক্রান্ত।

প্রিয়দা চক্রবর্ত্তী

প্রিয়দা তরুণ বয়সে ছাত্র আন্দোলনের সংগঠক ছিলেন। তাঁহাকে বাথুয়া ডাকাতি ও ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে সরকারের বিশেষ আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই।

অস্ত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে অস্ত্র আইনে তাঁহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় দণ্ডবিধিতে অস্ত্র আইনে অভিযুক্তদের দুই বৎসরের বেশী কারাদণ্ডের বিধি ছিল না। কিন্তু ১৯৩৩ সালে বাংলা সরকার ফৌজদারী দণ্ডবিধির ঐ আইন সংশোধিত করিয়া অস্ত্র-প্রাপ্তির অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইতে পারিবে এই ব্যবস্থা করিয়া লয়। কিশোর বালক প্রিয়দাকে এই আইনের বিধি প্রয়োগ করিয়াই সর্ব্বোচ্চ দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।

তাঁহার প্রায় ১৩ বৎসর মেয়াদ খাটা হইয়াছে। দুরন্ত হাঁপানি রোগে তিনি ঢাকা জেলে শয্যাশায়ী। সাধারণ অবস্থায় যাঁহার মাত্র ২ বৎসর কারাদণ্ড হইলেই যথেষ্ট বিবেচিত হইত, সেক্ষেত্রে তিনি আজ ১৩ বৎসর জেলভোগ শেষ করিলেন। তথাপি বাংলা সরকার অসুখের অবস্থা বিবেচনায়ও তাঁহাকে মুক্তি দিতে নারাজ।

তিনি সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন, জেলে কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম গুপ্তচর হত্যা-প্রচেষ্টা মামলা

অমূল্য আচার্য্য

১৯৩০ সালের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার পর চট্টগ্রামের পলাতক আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিসের উপদ্রব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে অমূল্য অতি বালক বয়সে রাজনৈতিক কর্ম্মীদের সংশ্রবে আসেন। গ্রামের নির্ম্মল লালা নামে একটি যুবকের জালালাবাদ পাহাড়ে পুলিশের সহিত সংঘর্ষে নিহত হওয়ার সংবাদে বালক অমূল্যের মনে এক বিশেষ রেখাপাত করে। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১১ বৎসর।

১৯৩৩ সালে চট্টগ্রামের হিন্দু যুবকদের পরিচয় পত্র (আইডেনটিটি কার্ড) রাখার হুকুম জারী হয়। পরিচয় পত্র তিন প্রকারের ছিল—সাদা, নীল ও লাল। সাধারণের

জন্ম সাদা, একটু সন্দেহভাজনদের জন্ম নীল এবং যাহারা পুলিসের চক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হইত তাহাদের জন্য লাল কার্ডের ব্যবস্থা হয়। অমূল্যের জন্ম লাল কার্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঐ সময়ে চট্টগ্রামে সন্দেহ-ভাজন যুবকদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য কর্তৃপক্ষ গ্রামে গ্রামে "গ্রাম্য কমিটি" গঠন করিত। উক্ত কমিটি সপ্তাহে একদিন গ্রামে সভা ডাকিয়া সন্দেহ-ভাজন ছেলেদের সাপ্তাহিক গতিবিধি আলোচনা করিত। সরকারী হুকুমে সন্দেহভাজন যুবকদের সভায় আসা বাধ্যতামূলক ছিল।

১৯৩৫ সালের শেষদিকে ফেরারী বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষার অভিযোগে ম্যাজিষ্ট্রেট অমূল্যের উপর এক অন্তরীণ আদেশ জারী করে। এই আদেশ যাঁহাদের উপরে জারী হইত তাঁহারা কোন স্কুলে ভর্তি হইতে পারিতেন না। এইভাবে ১৬ বৎসর বয়সে ৯ম শ্রেণীতেই অমূল্যের পাঠ্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একজন পুলিস গুপ্তচর হত্যা-প্রচেষ্টার অভিযোগে জরুরী আদালতের বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইয়াছিল। পরে হাই-কোর্টের বিচারে অল্প বয়স বিবেচনায় উহা কমাইয়া ১০ বৎসর কারাদণ্ড করা হয়।

জেলে তিনি কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন ভঙ্গের মামলা (চট্টগ্রাম)

বিনোদ দত্ত

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা সম্পর্কে ১৯৩০ সালে বিনোদ দত্তের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয় এবং পুরস্কার ঘোষিত হয়।

ফেরারী অবস্থায় পুলিস তাঁহার নামে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে এক আদেশ জারী করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হুকুম দেয়।

প্রায় ১১ বৎসর আত্মগোপন করিয়া থাকার পরে ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে তিনি গ্রেপ্তার হন। সংশোধিত ফৌজদারী আইন অমান্যের অভিযোগে বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক তিনি ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

মেছুয়াবাজার বোমার মামলা

১৯২৮-২৯ সালের কথা। পুরাতন বিপ্লবী নেতারা সবে মুক্তি পাইয়াছেন। দেশের মধ্যে একটা নূতন জাগরণের ঢেউ। যুব সম্প্রদায়ের মনোভাব—'কিছু একটা করিতে হইবে', 'বাংলা চিরদিন স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতবর্ষকে পথ দেখাইয়াছে, এবারও তাহা দেখাইতে হইবে।'

জেলের মধ্যে যাঁহারা আবদ্ধ ছিলেন তাঁহাদের বাহিরে আসিয়া মিলিয়া মিশিয়া একত্র হইয়া কাজ করার কিছুটা চেষ্টা হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কর্ম্মপন্থার অভাবে সংগঠন সম্বন্ধে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী না থাকায়, দলগত সঙ্কীর্ণতা ও ব্যক্তিগত ক্ষমতার কলহে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না। অতীতে ১৯২৪ সালে ঐরূপ একটা মিলন হইয়াছিল। নেতাদের ১৯২৮ সালে বন্দী নিবাস হইতে মুক্ত হইয়া আসার পরে সে মিলন একদম ভাঙ্গিয়া যায়। বিভিন্ন দলগুলির নেতৃস্থানীয়দের নিষ্ক্রিয়তা ও দলাদলির সঙ্কীর্ণতা প্রত্যেক দলের সাধারণ কর্ম্মীদের অসহিষ্ণু করিয়া তোলে এবং প্রধান দলগুলি হইতে মধ্য স্তরের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিরা একত্রে এক গুপ্ত সম্মেলনে একটা কিছু করার সিদ্ধান্ত করেন। ইঁহারাই পরে "রিভোল্ট গ্রুপ" নামে পরিচিত হন। ইঁহারা ঘোষণা করেন যে, সকল দলেরই কার্য্যক্রম যখন এক, তখন আলাদাভাবে থাকার কোন অর্থ হয় না—বরং বহু শক্তি ঝগড়া ও দলাদলিতে অপচয় হইতেছে। ইঁহাদের ইচ্ছা যে শীঘ্রই সমস্ত বাংলাদেশে ব্যাপক বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ আরম্ভ হউক।

এই উদ্দেশ্য লইয়া রিভোল্ট গ্রুপ বাংলার কয়েকটি জিলায় কাজ আরম্ভ করে। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যেও প্রকৃত কাজের তুলনায় 'কিছু একটা করিতে হইবে' এই প্রচারই বেশী হইতে থাকে। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ইঁহাদের তরফ হইতে একটি লাল ইস্তাহার দেওয়া হয়। ফলে ইঁহাদের উপর পুলিসের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয়। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পুলিস বাংলার বহু স্থানে খানাতল্লাসী করে এবং কলিকাতায় মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে সতীশ পাকড়াসী ও নিরঞ্জন সেনকে গ্রেপ্তার করে। সুধাংশু দাসগুপ্ত নামে আর একটি

যুবকও ঐ বাড়ীতে বোমা ও রিভলবার লইয়া গ্রেপ্তার হন। কিছুদিন পরে কলিকাতার পাঁচু ধোপানী লেনে শচীন করগুপ্ত ও অন্যান্য কয়েকজন যুবক বোমা তৈরারীর মাল-মসলাসহ গ্রেপ্তার হন। ইহা ছাড়াও বরিশাল, খুলনা, বহরমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় ৩০ জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া একটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। ইহাই মেছুয়াবাজার বোমার মামলা নামে প্রসিদ্ধ।

এই মামলায় যাঁহাদের জেল বা দ্বীপান্তর হইয়াছিল তাঁহাদের সকলেই মুক্তি পাইয়াছেন, কিন্তু উহার অন্যতম নেতা শচীন করগুপ্ত এখনও জেলে রহিয়াছেন।

শচীন করগুপ্ত

মেছুয়াবাজার বোমার মামলার অন্যতম নেতা শচীন করগুপ্ত ঢাকা জেলে নিরপত্তা বন্দী হিসাবে আটক আছেন। একবৎসর নয়, দুই বৎসর নয়, শচীন কর আজ ১৫ বৎসরের উপর জেল ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অবশ্য মাঝখানে (১৯৩২ সালে) অল্প কিছু দিনের জন্য মেদিনীপুর জেল হইতে পলাইয়া তিনি অজ্ঞাত জীবন যাপন করিয়াছেন।

বরিশাল জিলায় নলচিড়া গ্রামে কমরেড শচীনের বাড়ী। জাতীয় আন্দোলনে এই গ্রামের দান যথেষ্ট এবং সেই সাথে শচীনদের বাড়ীর নামও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বাবা ও কাকারা ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন হইতেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাই বাল্য-জীবন হইতে শচীন তাঁহার পরিবার হইতেই দেশের কাজে দীক্ষা পান। ১৯১৪ সালের যুদ্ধের সময় হইতে বালক শচীন বৈপ্লবিক দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২১ সালে গান্ধীজী ও দেশবন্ধুর ডাকে যখন বাংলার যুবকরা স্কুল ও কলেজ ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন, তখন শচীন করও লেখাপড়া ছাড়িয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময় পিকেটিং ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে তিনি গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ যখন কমার মুখে, তখন শচীন ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া তাঁহার নিজগ্রামে একটি আশ্রম গড়িয়া তোলেন। নলচিড়ায় সেই 'বিবেক আশ্রম'

সমগ্র জেলায় স্বদেশী মহলে খুবই পরিচিত। ঐ আখড়ায় সেখানকার ও আশপাশের গ্রামের ছেলের দল প্রত্যহ নিয়মিত একত্র হইয়া শরীর চর্চ্চা করিত। বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পড়িয়া সেই সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিত এবং গরীবদের জন্য মুষ্টিভিক্ষা আদায় করিত। এখানে জোর দিয়া উল্লেখ করা যায় যে, তখনকার দিনে বরিশাল জেলায় বিশেষ করিয়া গৌরনদী থানায় প্রায় প্রতি গ্রামে যে সব ব্যায়াম সমিতি ও লাইব্রেরী গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার মূল কারণ 'বিবেক আশ্রমের' অনুপ্রেরণা। আবার সেই সাথে ইহাও বলা দরকার, নলচিড়ার এই আশ্রমের প্রাণ ছিলেন শচীন করই।

১৯২৪ সালে বাংলার অনেক জিলা হইতে বহু যুবক কর্ম্মী বৈপ্লবিক কার্য্য-কলাপের জন্য ধরা পড়েন। শচীন তখন বরিশালে থাকিয়া তাঁহাদের দলকে বাঁচাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সেই সময় তাঁহার কার্য্যকলাপের ভিতর যে অদ্ভুত নিষ্ঠা দেখা গিয়াছিল তাহা সত্যই অতুলনীয়। নিজের ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপর তাঁহার কোন দিনই নজর ছিল না। বন্ধুবান্ধবদের প্রতি মমত্ববোধ এবং সরল স্নেহশীল ব্যবহারে সহকর্ম্মীদের হৃদয়ে তাঁহার স্থান ছিল সবার উপরে।

বরিশালে সংগঠনকে কিছুটা শক্তিশালী করিয়া তিনি পটুয়াখালী সহরে কাজের দায়িত্ব লইয়া যান। ঐ সময়ে তিনি পটুয়াখালী মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পটুয়াখালীর রাজনৈতিক কাজকর্ম্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ওখানে কাজের ফলে তিনি পুলিসের নজরে পড়িয়া যান। গুপ্তদল সংগঠনের কাজে তাঁহাকে ভোলায় যাইতে হয়, সেখানে কিছুদিনের মধ্যে ছাত্র ও যুবক সংগঠন গড়িয়া তোলেন।

১৯২৬ সালে তাঁহারই প্রচেষ্টায় শ্রদ্ধেয় ডাঃ ভুপেন দত্তের সভাপতিত্বে -বরিশাল জেলায় যুব-সম্মেলন তাহার নিজ গ্রাম নলচিড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়।

তাঁহার সংগঠন-ক্ষমতার জন্য তাঁহাকে হুগলীতে কংগ্রেসের কাজে পাঠান হইয়াছিল। তিনি হুগলী বিদ্যামন্দিরে থাকিয়া সকল সময়ের কর্ম্মী হিসাবে কংগ্রেসের সংগঠন করিতেন। আজও হুগলীর প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতারা তাঁহারা কথা সস্নেহে ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন।

যখনই নুতনভাবে সংগঠন গড়িয়া তোলা দরকার তখনই সেখানে কমরেড শচীন করকে পাঠান হইত।

তিনি ১৯২৮ সালে আবার বরিশাল জিলায় কাজের জন্য ফিরিয়া আসেন এবং ১৯২৮-২৯ সালে জেলা কংগ্রেস কমিটির সহঃ সম্পাদক বি, পি, সি, সি, এর সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

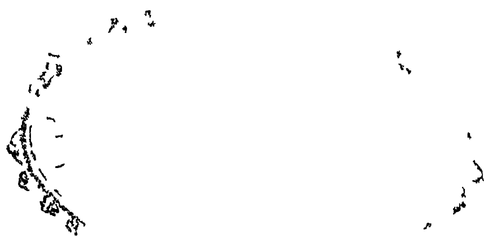
১৯২৯ সালে মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় ধৃত হইয়া তিনি ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩২ সালে মেদিনীপুর জেল হইতে পলায়ন করার জন্য অস্ত্র আইনে মোট ১৫ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আন্দামানে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার পূর্ণ দণ্ডভোগের পরেও মুক্তি না দিয়া জেলগেটেই তাঁহাকে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এত দীর্ঘ দিন জেলভোগের দরুণ তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিনি অর্শ, অজীর্ণ ও হৃদরোগে ভুগিতেছেন।

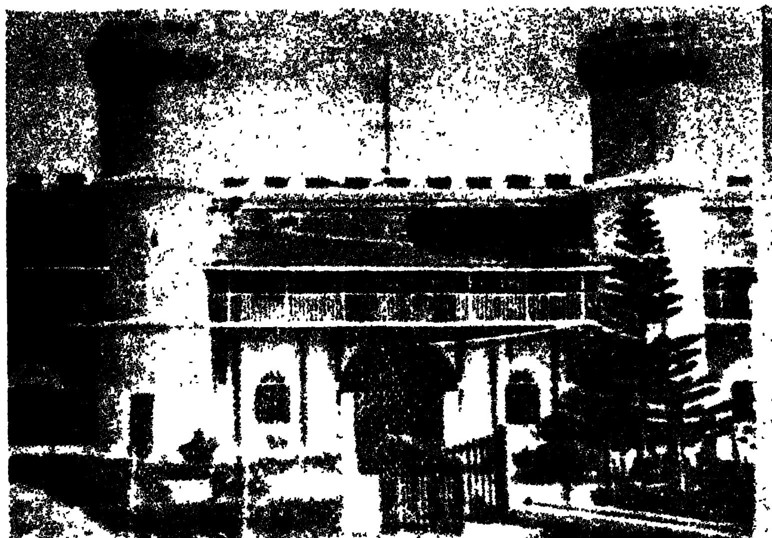
তিনি আর সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন, কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৪২ সালে ঢাকা জেল হইতে দেশবাসীকে ফ্যাসিজম-বিরোধী যুদ্ধ সম্পর্কে আহ্বান জানাইয়া যে সব বন্দী বিবৃতি দিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম।



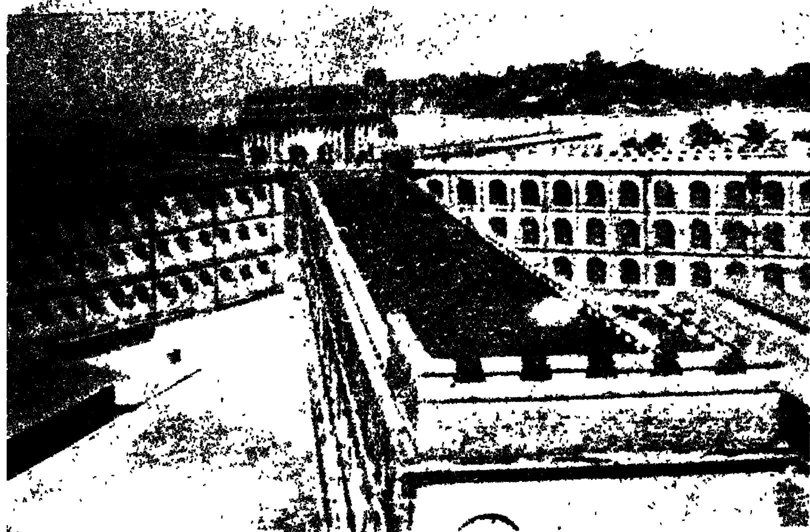


আন্দামান দ্বীপের

এই কারাগারে বাংলার বীর বন্দীরা নির্ব্বাসিত হইয়াছিল



পোর্টব্লেয়ার জেলের বহির্দৃশ্য



সেলুলার জেলের ভিতর কক্ষগুলির দৃশ্য



প্রথম অনশনের শহীদ

মহাবীর সিং

১৯৩৩ সালে আন্দামান বন্দীদের প্রথম অনশন ধর্ম্মঘট হয়। তাহার ফলে পাবনার মোহিত মৈত্র, ময়মনসিংহের মোহন দাস ও যুক্তপ্রদেশের মহাবীর সিং-এর জীবন অবসান হয়।

বাংলার বীর বন্দীদের

কারামুক্তির আন্দোলন

গণ-আন্দোলনের সূচনা

উনিশশো ষোল সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতাকামী বীর যোদ্ধাদের নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া আন্দামান দ্বীপে প্রেরণ করিতে সুরু করে। সুদূর দ্বীপে নির্ব্বাসনের এই নীতি ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত চলে। তারপর ছয় বৎসর এই নিষ্ঠুর প্রথা স্থগিত থাকে। ১৯৩২ সালে পুনরায় ২৬ জনের একটী বন্দী দলকে আন্দামানে পাঠান হয়।

প্রত্যেকটি বন্দীর জন্য এক একটী ক্ষুদ্র নির্জ্জন-কক্ষ বরাদ্দ হয়। বিদেশী শাসক-বর্গের প্রতিশোধ-স্পৃহা এই সব মুক্তি-সাধকদের দণ্ডিত জীবনকে মনুষ্য জীবনের অভিশাপে পরিণত করে। তাঁহাদের পানীয় ও আহার্য্য এবং দিন যাপনের বন্দোবস্ত এতই জঘন্য ছিল যার ফলে বন্দীদের মন-প্রাণ প্রতিটী মুহূর্ত্তে বিদ্রোহের আগুণে জ্বলিতে সুরু করে। বন্দী-নিবাসের কর্ত্তৃপক্ষের হুকুমের বিরুদ্ধে বন্দীদের স্বাধীনমন প্রতিরোধ-স্পৃহায় জাগ্রত হইতে থাকে। পদে পদে তাঁহাদের জন্য চাবুক মারা, ডাণ্ডাবেড়ী লাগান, গাত্রের চর্ম্ম কাটিয়া লবণ-নিক্ষেপ প্রভৃতি সাজার ব্যবস্থা হয়। ১৯৩২-৩৩ এই এক বছরে যখন বন্দীদের সংখ্যা ১০৭ এ পৌঁছায় তখন তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের নির্ম্মম ব্যবহারের প্রতিবাদে ১৯৩৩ সালে প্রথম অনশন ধর্ম্মঘট করেন। এই ধর্ম্মঘটের ফলে তিনজন বন্দীর জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হয়। যেদিন সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের প্রতিবাদে বীর বন্দী মোহিত অধিকারী, মোহন দাস ও মহাবীর সিংএর জীবন অবসান হয় সেদিনটীর কথা কোন ভারতবাসীই ভুলিতে পারে নাই।

তারপর হইতে প্রতি বছরই দলে দলে এই ধরণের বন্দীদের আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরণ করা হইতে থাকে। ১৯৩৭ সালে আন্দামানে নির্ব্বাসন বন্দীর সংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়ায় প্রায় আড়াই শত।

১৯৩৭ সালের নূতন শাসন-সংস্কার আইন প্রবর্ত্তিত হইবার সময় ভারতীয় জনসাধারণ আশা করিয়াছিল সন্ত্রাসবাদী বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল, গভর্ণমেণ্ট এই সব বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে অনমনীয় মনোভাব পরিত্যাগ করিল না। ফলে, ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার দ্বীপে সেলুলার জেলে দ্বীপান্তরিত ২৩৪ জন বন্দীর ঐতিহাসিক অনশন শুরু হয়। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন জেল ও দেউলী প্রভৃতি বন্দী-নিবাসে আবদ্ধ প্রায় এক হাজার রাজবন্দী আন্দামান বন্দীদের দাবীর সমর্থনে অনশন ধর্ম্মঘট করেন। ইহার ফলে ভারতের বুকে এক বিরাট আলোড়ন দেখা দেয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাংলার জনগণের মনোভাবকে রূপ দিয়া আন্দামানের ধর্ম্মঘটীদের আশীর্ব্বাণী পাঠান—সমগ্র বাংলা তার নির্ব্বাসিত সন্তানদের পাশেই আছে।

বাংলার ছাত্রেরা পার্কে পার্কে মিটীং করিতে থাকে। রাস্তায় রাস্তায় ছাত্র ও জনসাধারণের বিরাট মিছিল দেখা দেয়। সর্ব্বত্রই এক আওয়াজ—আন্দামান বন্দীদের মুক্তি চাই।

মহাত্মা গান্ধী আন্দামান বন্দীদের কাছে অনশন ত্যাগের অনুরোধ জানান। তিনি সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত জানিতে চাহেন। ২৮শে আগষ্ট গান্ধীজীর টেলিগ্রামের উত্তরে সন্ত্রাসবাদ-যুগের বন্দীরা ঘোষণা করেন:

"সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে আপনি আমাদের সুস্পষ্ট মতামত জানাবার সুযোগ দিয়েছেন। সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একথা আপনাকে জানাতে গৌরব বোধ করছি যে, আমাদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা এতদিন সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, আজ তাঁদের সেপথে কারো বিশ্বাস নাই। রাজনৈতিক অস্ত্র কিম্বা পন্থা হিসাবে এ পথের ব্যর্থতা আমরা সবাই স্বীকার করি। আপনার মারফৎ সমগ্র দেশবাসীর কাছে একথা আমরা ঘোষণা করতে চাই। আমাদের মতে, সন্ত্রাসবাদের পথে দেশের স্বাধীনতা নিকটবর্ত্তী তো হয়ই না, বরং এ পথে স্বাধীনতা সুদূর পরাহত হয়।"

গান্ধীজী প্রমুখ নেতাদের অনুরোধে ৩৫ দিন পর তাঁহারা অনশন ধর্ম্মঘট ভঙ্গ করিলেন।

বন্দীমুক্তির সে আন্দোলন একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের মুক্তি দিলেন না বটে, কিন্তু ১৯৩৮ সালেই দ্বীপান্তরিত বন্দীদের নিজ নিজ প্রদেশের কারাগারে ফিরাইয়া আনা হইল। এই বন্দী-মুক্তি আন্দোলনের ভিতর দিয়া বাংলার ছাত্র সমাজ দেশের স্বাধীনতার জন্য বীর যোদ্ধাদের শ্রদ্ধা করিতে শিখিল, বন্দী মুক্তির প্রশ্ন দেশবাসীর অন্তরে গভীর ছাপ টানিয়া দিল।

১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে গান্ধীজী বাংলায় আসিয়া আলীপুর ও দমদম জেলে বন্দীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা করিয়া তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন যে, বন্দীরা আন্তরিকতার সহিত সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন তিনি বাংলা গভর্ণমেন্ট ও তদানীন্তন মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত বন্দী মুক্তির প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করেন। আলোচনার ফলে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, মন্ত্রীমণ্ডলী তখন হইতে এক বৎসরের মধ্যে সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিবেন এবং বন্দীদেরও তিনি ঐরূপ আশ্বাস দেন। (এই সম্পর্কে গান্ধীজী ও বাংলার প্রধান মন্ত্রী স্যর নাজীমউদ্দিনের সহিত যেসব পত্র বিনিময় হইয়াছিল আমরা তাহা এই বইয়েরই অন্যত্র প্রকাশ করিলাম)।

এক বৎসর কাটিয়া গেল কিন্তু গান্ধীজীর সে বিশ্বাস সত্যে পরিণত হইল না। বাংলা সরকার বন্দীদের মুক্তি দিল না। সারা দেশময় আবার নূতন করিয়া বন্দী মুক্তির আন্দোলনকে জাগাইয়া তুলিবার দাবী উঠিল। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ সংগঠন কংগ্রেস ১৯৩৯ সালের মে মাসে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল:

"জরুরী অবস্থার মধ্যে বিশেষ ক্ষমতা বলে বহু বন্দী আজ পর্য্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ। এই সমস্ত বন্দীরা সন্ত্রাসবাদের প্রতি তাঁহাদের অনাস্থা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহাদের আটক রাখার মধ্যে কোন ন্যায় বিচার নাই—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই মত পোষণ করে। বাংলা ও পাঞ্জাবের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সমস্যাকে সর্ব্বভারতীয় এক বিরাট আন্দোলনে রূপ দিবার সংকল্প এ-আই-সি-সির এই বৈঠক গ্রহণ করিতেছে। অবিলম্বে বিনাশর্তে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে দেশময় জোর আন্দোলন চালানোর

জন্য সমস্ত কংগ্রেস কমিটির কাছে ওয়ার্কিং কমিটি যাহাতে নির্দ্দেশ পাঠায় এই সভা তার নির্দ্দেশ দিতেছে।" (১৯৩৯ সালের মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব)।

১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে আলীপুর ও দমদম জেলে বন্দীরা আবার অনশন আরম্ভ করেন। আটাশটী দিন আটাশটী রাত সমস্ত বন্দী উপবাসে কাটান।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে একটী "বন্দী মুক্তি সাব-কমিটি" গঠিত হয়। এই কমিটি ডাঃ নারায়ণ রায়, সতীন সেন, বিমলপ্রতিভা দেবী, মুজফ্‌ফর আহমদ, গোপাল হালদার, নিরঞ্জন সেন, শান্তি রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়। এই কমিটি সারা বাংলায় বন্দী-মুক্তি আন্দোলন পরিচালনা করিতে থাকেন। বাংলার সর্বত্র এই সব বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দানের জন্য প্রবল দাবী উত্থিত হয়। এবারকার আন্দোলনে ছাত্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণ ছাড়াও শ্রমিক ও কৃষকরা বহু সংখ্যায় যোগদান করেন।

গান্ধীজী বন্দীদের অনশন স্থগিত রাখিতে অনুরোধ জানাইয়া এঁক ব্যক্তিগত পত্র লেখেন। মহাদেব দেশাই সেই পত্র লইয়া বন্দীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ বিধান রায় ও ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ এ বিষয়ে বন্দীদের সহিত দেখা করেন। বি-পি-সি-সি বন্দী মুক্তি কমিটির পক্ষ হইতে অনশনের ২৮ দিন পর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষ বসু, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, রবি সেন, মুজফ্‌ফর আহমদ ও সোমনাথ লাহিড়ী বন্দীদের সহিত দুই জেলে দেখা করিয়া তাঁহাদের অনশন স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও বাংলার নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসে বন্দীরা অনশন স্থগিত রাখেন।

এই সময় গভর্ণমেণ্ট বন্দী মুক্তির প্রকৃত সমস্যাকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে এক কৌশল উদ্ভাবন করে। সমস্ত বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে সুপারিশ করার জন্য একটী "পরামর্শদাতা কমিটি" নিযুক্ত হয়। এই কমিটি ১৪৫ জনের বিনাশর্ত্তে মুক্তির সুপারিশ করে, ইঁহাদের মধ্যে মাত্র তিনজন দীর্ঘ দিনের মেয়াদী বন্দী ছিলেন। বাকী ১৪২ জনের দণ্ডকালের খুব অল্প দিনই বাকী ছিল। উপরোক্ত তিন জনের স্বাস্থ্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়াই কমিটি তাঁহাদের মুক্তির

সুপারিশ করিয়াছিল। প্রায় ৪০ জন বন্দীকে শর্ত্তাধীনে মুক্তির সুপারিশ করা হয়। কিন্তু যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত প্রায় ৩৫ জন বন্দীর সম্বন্ধে ঐ কমিটি কোন বিবেচনাই করে নাই।

তাহার পর ১৯৩৯ সালে মহাযুদ্ধ বাধিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতায় সমগ্র দেশ উদ্বেলিত হইতে লাগিল। সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্ট তখন একজন দেশভক্তকেও কারাগারের বাহিরে রাখিবে না। গণ আন্দোলনকারী সকল দেশ প্রেমিককে এক এক করিয়া গবর্ণমেণ্ট কারাগারে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। চারিদিকে নিছক দমননীতি। কিছুদিনের জন্য এই সব বন্দীদের মুক্তির সম্ভাবনা তিরোহিত হইল।

১৯৪১ সালে জুন মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গেল।

১৯৪২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী কারাপ্রাচীরের অন্তরাল হইতে যুদ্ধের ঐতিহাসিক স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া ২৪ জন বন্দী এক বিবৃতি দেন। তাঁহারা বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন,—"আজ ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ চালানো হইতেছে, তাহা আর শুধু রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সাধারণ যুদ্ধ নয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিরাট মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই এই যুদ্ধ প্রথমতঃ ও মূলতঃ মানব ইতিহাসের বৃহত্তম মুক্তির যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রগতিশীল জাতিসমূহের ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্টে যোগদান ছাড়া বৃটিশ শাসকবর্গের পক্ষে আর অন্য কোন পন্থা ইতিহাস রাখে নাই; এবং জনসাধারণ এই যুদ্ধে স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করায় গণ-উদ্যম এত বাড়িয়া যাইবে যে এই জনযুদ্ধ পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিবে। এই দুই ঘটনায়ই ইহার নিশ্চিত গ্যারাণ্টি যে ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হইবে এবং ইহা সারা পৃথিবীতে মুক্তি ও প্রগতির শক্তি আরো দৃঢ় করিয়া তুলিবে।" (সমস্ত বিবৃতিটি বইয়ের অন্যত্র প্রকাশিত হইল)।

ভারতের সাম্রাজ্যবাদী কর্ত্তৃপক্ষ "চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া" এই জনবরেণ্য বন্দীদের বিবৃতি "ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের" প্রচারকার্য্যে ব্যবহার করে; অথচ তাঁহাদের মুক্তির কোন প্রশ্নই তুলে নাই।

আন্দোলন শুরু করার প্রতিজ্ঞা

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের নেতা এন-এম-জোশী ১৯৪২ এর ১২ই জুলাই নিখিল-ভারত রাজনৈতিক বন্দী-মুক্তি দিবস পালনের আবেদন জানান। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক পি-সি-জোশী, নিঃ ভাঃ কিষাণ সভার সভাপতি ইন্দুলাল যাজ্ঞিক এবং ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের সেক্রেটারী পেরিণ ভারুচা ঐ আবেদন অনুযায়ী ভারতের জনসাধারণকে ১২ই জুলাই "বন্দীমুক্তি দিবস" পালন করিতে আহ্বান করেন। এই আবেদনে তাঁহারা বিশেষ করিয়া সংস্কার-পূর্ব্ব যুগের বন্দীদের মুক্তির কথা উল্লেখ করেন। ("পিপল্‌স্ ওআরে"-৫.৭.৪২ এই আবেদন প্রকাশিত হয়)।

বাংলার শহর ও গ্রামে এই সময় অসংখ্য জনসভায় সমস্ত ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী বন্দীদের মুক্তির দাবী উত্থিত হয়।

তারপর ১৯৪২ এর ৯ই আগষ্ট। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীদের উপর সাম্রাজ্যবাদের যথেচ্ছ দমন নীতি শুরু হয়। প্রথমেই নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন।

২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৪২), ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য দেশময় আন্দোলন করার আহ্বান দেয়। জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য দেশব্যাপী জাতীয় ঐক্যের আন্দোলন শুরু হয়। সংস্কার-পূর্ব যুগের বন্দীদের মুক্তির জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। ২৩শে সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবে কমিউনিষ্ট পার্টি ঘোষণা করে: "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার ও আগের দিনের অন্যান্য বাংলার বীর রাজনৈতিক বন্দীদিগকে অভিনন্দন! ভগৎ সিংহের সহকর্ম্মী লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী ও অন্যান্য কমরেডদের প্রতি অভিনন্দন! কারা প্রাচীরের অন্তরালে জন-আন্দোলন হইতে দূরে থাকিয়াও তাঁহারা সন্ত্রাসবাদের পথ ত্যাগ করেন ও কমিউনিষ্ট মত গ্রহণ করিয়া প্রকৃত বৈপ্লবিকতার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের মুক্তির জন্য নির্ভীকভাবে লড়িবার উদ্দেশ্যে যে-সব কমরেড তাঁহাদের তরুণ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; হৃদয়হীন মস্তিকহীন আমলাতন্ত্র যাঁহাদের এখনও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া

রাখিয়াছে, পবিত্র মাতৃভূমি রক্ষায় বুকের রক্ত দিতে যাঁহারা প্রস্তুত তবু আমলাতন্ত্র যাঁহাদের ছাড়িতে রাজী নয়, সেই সব অজানা বীরদের প্রতি অভিনন্দন! বিদেশী সরকারের বাধা আছে বলিয়াই আজ তোমাদের আমরা আমাদের পাশে পাই নাই। কিন্তু শেষ ক্ষমতা জনগণের হাতে। এই জনগণের সাহায্যেই তোমাদের ফিরাইয়া আনিব—ইহাই আমাদের প্রতিজ্ঞা।"

*　　　　*　　　　*

"তোমাদের মুক্তির জন্য যখন আমরা দেশব্যাপী আন্দোলনে সহকর্মী দেশপ্রেমিক ও জনসাধারণের ক্রমশঃ বেশী সমর্থন পাইতেছিলাম, বিদেশী গভর্ণমেণ্ট তখন তোমাদের তো ছাড়িলই না, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য জাতীয় নেতাদের সাথে আলোচনাও চালাইল না, উপরন্তু জাতীয় আন্দোলনের উপর আঘাত হানিল, জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করিল, দেশব্যাপী সন্ত্রাস সৃষ্টি করিল। দেশ আজ নতুন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন।...... আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি—আমাদের এই আন্দোলনে তোমাদের মুক্তির প্রশ্ন সম্মানজনক স্থানেই থাকিবে। যদি তোমাদের মুক্তির জন্য আমরা জনগণকে একত্র করিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা তোমাদের কমরেড হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।"

তাহার পর হইতে সারা বছর ধরিয়া বাংলার জেলায় জেলায় জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবীর সঙ্গে সঙ্গে এই সব বন্দীদের মুক্তির আওয়াজ উঠিতে থাকে। হাজার হাজার স্বাক্ষর সংগৃহীত হয় বন্দীর-মুক্তির দাবীতে। অস্ত্রাগার মামলার বন্দীদের মুক্তির জন্য চট্টগ্রাম জেলার সহস্র সহস্র লোক স্বাক্ষর দেন। দিনাজপুরে কৃষক-ছাত্র-শ্রমিক ও মহিলাদের বিরাট মিছিলে রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য শত শত কণ্ঠে মিলিত দাবী উঠে। ১৯৪৩ এর ডিসেম্বরের শেষে ও ১৯৪৪ এর জানুয়ারীর প্রথমে বিভিন্ন জেলায় "বন্দীমুক্তি সপ্তাহ" প্রতিপালিত হয়। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের সুতাকলের শ্রমিকদের প্রবল আন্দোলনে সংস্কার-পূর্ব বন্দীদের মুক্তির কথা মুখরিত হইয়া উঠে।

বঙ্গীয় রেড-এড কমিটির উদ্যোগ

কমিউনিষ্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক রেড-এড কমিটি ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাস হইতে এই সব বন্দীদের মুক্তির আন্দোলন চালাইবার জন্য বিশেষ দায়িত্ব লইয়া কাজ সুরু করে। কমিটির পক্ষ হইতে ১৯৪৪ সালের প্রথমেই শাসন-সংস্কার-পূর্ব্ব যুগের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় সহস্র সহস্র ইস্তেহার প্রকাশ করা হয়। এই মেনিফেষ্টোকে ভিত্তি করিয়া সমস্ত জেলায় জনসমাবেশ হইতে থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালাইবার জন্য আহ্বান দেওয়া হয়। বন্দী-মুক্তির সভায় কংগ্রেস ও লীগের স্থানীয় নেতারা উপস্থিত থাকিয়া জনসাধরণের এই আন্দোলনে উৎসাহ দেন। রেড-এড কমিটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতীয়বাদী পত্রিকা এবং বিশেষ করিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র জনযুদ্ধ ও পিপলস ওআরে বন্দীদের স্বাস্থ্যের সংকটজনক অবস্থার বিবরণ প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৯৪৪সালের ২৪শে নভেম্বর বঙ্গীয় রেড-এড কমিটির সভাপতি মুজফ্‌ফর আহমদ সংবাদপত্রে একটী বিবৃতি দেন। বন্দীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক হওয়ায় কমিটির সভাপতি বাংলার সমস্ত দেশভক্তের নিকট আন্দোলনের জন্য আবেদন জানান। সমগ্র জাতির নামে তিনি মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার নিকট তাঁহাদের আশু মুক্তির জন্য ব্যবস্থা করিতে আহ্বান করেন। সর্বশেষে জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির নিকট তিনি আবেদন করেন, তাঁহারা যেন এই সমস্যাকে দেশবাসীর নিকট যথাযোগ্যভাবে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরেন, বহুদিন আমরা এই সহকর্ম্মীগণকে ভুলিয়া বসিয়া আছি, আজ সমস্বরে ইঁহাদের মুক্তির দাবী জানাইতে হইবে।

কমিউনিষ্ট পার্টির বঙ্গীয় রেড-এড কমিটির সভাপতি মুজাফ্‌ফর আহমদ নিম্নলিখিত বিবৃতিটি দিয়াছিলেন:

"আত্মীয়স্বজন এবং রাজনৈতিক বন্দীদের নিকট হইতে বারবার খবর আসিতেছে যে, ১৯৩৫ সালের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে যে-সকল

রাজনৈতিক কর্ম্মী দণ্ডিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই কারাগারের অভ্যন্তরে বহুবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছেন। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, কমরেড অনন্ত সিংহ ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ভীষণ অসুখে ভুগিতেছেন, এমন কি তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে।

"উল্লিখিত ৭২ জন রাজনৈতিক বন্দী দীর্ঘকাল কারদণ্ড ভোগ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেককে নির্দ্দিষ্ট ১৪।১৫ বৎসর কারাভোগান্তে পুনরায় ভারতরক্ষা বিধানে সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে আটক রাখা হইতেছে। ইঁহাদের অনেকে আবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও ১৪ বৎসর কারাজীবন ভোগের পরও মুক্তি পান নাই। যদিও জেল আইন অনুযায়ী তাঁহাদের ইতিমধ্যে মুক্তি পাওয়া উচিত ছিল।

"ইঁহাদের জীবন জাতির নিকট অতি মূল্যবান। জনসাধারণ ইঁহাদের জন্য অতন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে দেশবাসীর নিকট অতি সুপরিচিত, যেমন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার কমরেড অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও অম্বিকা চক্রবর্ত্তী এবং ওয়াটসন হত্যা প্রচেষ্টার মামলার সুনীল চ্যাটার্জ্জি; আন্তপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার প্রভাত চক্রবর্ত্তী; মেছুয়াবাজার বোমার মামলার শচীন করগুপ্ত এবং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট গুলীর মামলার নলিনী দাস এবং জগদানন্দ মুখার্জ্জি। ইঁহারা সকলে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই সন্ত্রাসবাদ নীতি বর্জ্জন করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে মুক্তি পাইয়া দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বিধ্বস্ত জনগণকে সেবা করিবার জন্য তাঁহারা ব্যাকুল—একথা জানাইয়াছেন। ইঁহাদের জীবনের মূল্যবান অংশ জেলেই কাটিল। ইঁহাদের জেলে পচিয়া মরিতে দেওয়া কেবলমাত্র আমাদের দেশপ্রেমের অবমাননা নহে, মানবীয় নীতিকেও অবজ্ঞা করা। এই শোকাবহ বার্ত্তা আজ আমাদের নিদারুণভাবে আলোড়িত করিয়াছে।

"সেই জন্য আমরা হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে, কংগ্রেস, মুস্লিম লীগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি সকল দলের কর্ম্মীগণকে আবেদন জানাইতেছি যে, ইঁহাদের মুক্তির জন্য সকলেই তৎপর হউন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট অবিলম্বে দাবী জানান। পরিষদের সর্ব্বদলের সভ্যগণকে আজ ইঁহাদের জন্য একত্র হইয়া মুক্তির দাবী জানাইতে হইবে।

আমাদের জাতির নামে আমরা মুস্লিম লীগ মন্ত্রিসভার নিকট দাবী জানাইতেছি যে, তাঁহারা অবিলম্বে অগ্রসর হইয়া আমলাতান্ত্রিক সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করিয়া ইঁহাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। সর্ব্বশেষে জাতীয় পত্রিকাগুলির প্রতি আমাদের নিবেদন, তাঁহারা যেন এই সমস্যাকে দেশবাসীর নিকট যথাযোগ্য ভাবে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরেন। বহুদিন আমরা এই সহকর্ম্মিগণকে ভুলিয়া বসিয়া আছি। আজ সমস্বরে ইঁহাদের মুক্তির দাবী জানাইতে হইবে।"

বন্দীদের পরিচয়, স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া সমস্ত দেশবাসীর অবগতির জন্য রেড-এড কমিটি মার্চ্চ মাসে "বাংলার বিস্মৃত বন্দীরা" নামে একটী পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই বইখানি বাঙ্গালীর মনে নূতন করিয়া বন্দীদের কথা জাগাইয়া তোলে। একমাসের মধ্যেই ৫ হাজার কপি পুস্তক বিক্রয় হইয়া যায়। সমস্ত জেলা হইতেই দাবী আসিতে থাকে, এই বই আরো চাই। সমস্ত দলের রাজনৈতিক নেতা, কর্ম্মী ও জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি এই আন্দোলনের সাহায্যে অগ্রসর হইতে থাকেন।

মুক্তি-আন্দোলনে গণ-জাগরণ

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলার ৪১ জন সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও দলমত নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন নেতা ও এম, এল, এ একটী যুক্ত বিবৃতিতে বাংলার বীর বন্দীদের মুক্তি দাবী করেন। দুঃখের বিষয়, বন্দীদের মুক্তি আন্দোলনকে সর্ব্বব্যাপী করিবার আবেদনে যখন দলমত নির্ব্বিশেষে সমস্ত নেতাই অগ্রসর হইলেন, তখন ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, শ্রীযুত কিরণ শঙ্কর রায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মৌলভী ফজলুল হক এই আবেদনে স্বাক্ষর করিতে রাজী হন নাই। নেতাদের আবেদনটী নীচে দেওয়া হইল:

১৯৩৭ সালের পূর্ব্ব হইতে যে রাজনৈতিক বন্দীরা দীর্ঘ দিনের মেয়াদে কারাবাস করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মুক্তির জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করার যে প্রতিশ্রুতি আমাদের দেশবাসী ১৯৩৮ সালে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ সেই প্রতিশ্রুতির কথা বিশেষভাবে স্মরণ করার সময় আসিয়াছে। এই দেশপ্রেমিক বন্দীরা হইলেন

বীরশ্রেষ্ঠের দল ; তাঁহাদের জীবন হইল আমাদের জাতীয় সম্পদ। কে না জানে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় অভিযুক্ত গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং প্রমুখ বীরদের কথা? যে অম্বিকা চক্রবর্ত্তী স্বদেশী যুগ হইতে দেশের কাজে জীবন সমর্পণ করিয়া অকাতরে রাজরোষ সহ্য করিতেছেন, তাঁহার কথা কে না জানে? রমেশ চট্টোপাধ্যায়, কালী চক্রবর্ত্তী ও হরিপদ ভট্টাচার্য্যের মত যে তরুণ দেশসেবকরা পরম উদ্দীপনায় মুক্তিসংগ্রামে নামিয়া আজ যথাক্রমে ১৮, ১৭ ও ১৬ বৎসর কারাবাস করিতেছেন, তাঁহাদের কথা আজ আমরা স্মরণ করিতেছি। এক সময় ইঁহাদের মধ্যে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু ইঁহারা সে মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ও সেই মর্ম্মে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে জানাইয়াছেন। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে যখন তাঁহারা কারাগারে অনশন ধর্ম্মঘট করেন, এবং যখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন বিপুল উদ্যমে চালাইয়া যাওয়া হইবে, এই কথা জানাইলেন, তখন তাঁহারা অনশন স্থগিত রাখিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। জনগণের দাবীর প্রতি নির্ম্মম আমলাতন্ত্র দৃক্‌পাত করে নাই। যখন বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন একটি বিবৃতিতে জানান যে, ভারতবর্ষকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে যথাযোগ্য স্থান লইতে হইবে, তখন সরকার নির্লজ্জভাবে সেই বিবৃতি আমলাতন্ত্রের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতে সঙ্কোচবোধ করে নাই, কিন্তু ঐ দেশভক্ত বন্দীদের মুক্তি দিবার মত সুমতি সরকার দেখায় নাই। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে গান্ধীজী বন্দীদের বলিয়াছিলেন 'আপনাদের মুক্তি ঘটাইতে না পারা পর্য্যন্ত আমার সুখ ও শান্তি নাই।' কারাগারে তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। আমাদের কাছে আজ তাঁহাদের মত দেশভক্তের উপস্থিতি যেমন প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন আর কখনও হয় নাই। আজ আমরা চাই যে, আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া দেশসেবায় জীবন নিবেদন করিবার সুযোগ যেন অবিলম্বে তাঁহাদের দেওয়া হয়।

* * *

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন ঃ

কংগ্রেস—শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, জে, সি, গুপ্ত, এম-এল-এ, নলিনাক্ষ্য সান্যাল, এম-এল-এ, ডি, এন, মুখার্জ্জি, এম-এল-এ, ঈশ্বরদাশ জালান, এম-এল-এ, রাধানাথ দাশ, এম-এল-এ, বঙ্কিম মুখার্জ্জি, এম-এল-এ, অতুল কুমার, এম-এল-এ, শ্রীযুত বসন্তলাল মুরারকা, সীতারাম সাকসেরিয়া, অধ্যাপক কে, পি, চট্টোপাধ্যায়।

লীগ—আবুল হাশেম, এম-এল-এ, আবদুল হামিদ চৌধুরী, খায়রুল আনাম খান, চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (লাল মিঞা), এম-এল-সি।

কৃষক-প্রজা নেতা—এ, মহম্মদ জান, এম-এল-সি, হাসান আলি, এম-এল-এ।

লেখক ও শিল্পী—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, যামিনী রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।

সাংবাদিক—হেমচন্দ্র নাগ (সম্পাদক, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড), ধীরেন্দ্রনাথ সেন (সহযোগী সম্পাদক, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'), চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য (সম্পাদক, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'), বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, 'যুগান্তর'), আবদুর্ রেজ্জাক মালিহাবাদী (সম্পাদক, 'রোজানা হিন্দ'), খগেন্দ্রনাথ সেন (সম্পাদক, ন্যাশনালিস্ট), মুজিবর রহমান খাঁ (সহযোগী সম্পাদক, আজাদ'), মইজুদ্দিন (সম্পাদক, অল্ হক্)।

মহিলা নেত্রী—এলা রীড, সীতা চৌধুরী, নীলিমা মুখোপাধ্যায়।

অন্যান্য জননেতা—আনন্দীলাল পোদ্দার, এম-এল-এ (ভূতপূর্ব্ব মেয়র), ভবানী সেন (সম্পাদক, কমিউনিষ্ট পার্টি, বাংলা কমিটি) মৃণালকান্তি বসু (সভাপতি, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস), মুজফ্ফর আহ্মদ (সভাপতি, নিখিল ভারত কিসান সভা), অধ্যক্ষ পি, কে, বসু এবং ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত।

সর্ব্বদলের মিলিত প্রচেষ্টা

মুক্তির জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন সৃষ্টির প্রস্তাব

১লা জুন (১৯৪৫) রেড-এড-কমিটির উদ্যোগে একটী সাংবাদিক সম্মেলন আহুত হয়। সেই সম্মেলনে কমিটির সভাপতি মুজফ্‌ফর আহমদ একটী বিবৃতি দেন এবং আন্দোলনের সফলতার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। সভার শেষে একটী "সর্ব্বদলীয় বন্দীমুক্তি কমিটি" গঠিত হয়। সভাপতি মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁহার বিবৃতিতে বলেন :

নূতন শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ব হইতে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙ্গলার যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ সন্তান দীর্ঘকালের মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন, দণ্ডভোগান্তে যাঁহাদের অনির্দ্দিষ্টকাল ধরিয়া বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছে অথবা সন্দেহের উপর যাঁহাদের বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছে, দেশবাসী আজ তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইতে চলিয়াছে। দীর্ঘকাল দেশবাসীর চক্ষের ও স্মৃতির অন্তরালে কারাপ্রাচীরের মধ্যে তাঁহারা ভগ্নস্বাস্থ্য ও ভগ্নোদ্যমে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে চলিতেছেন। অবিলম্বে তাঁহাদের মুক্তির দাবী লইয়া দেশের জনমতকে প্রবলভাবে জাগ্রত করিতে হইবে।

এই সম্মেলনে মুজফ্‌ফর আহমদ এক সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন ও তাহা গৃহীত হয়।

তিনি বলেন যে, অতীতে সন্ত্রাসমূলক কার্য্য কলাপের অভিযোগে অথবা সন্দেহে যাঁহাদের আটক রাখা হইয়াছে তাঁহাদের কেহই বর্ত্তমানে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন এবং বারংবার তাঁহারা এই মর্ম্মে ঘোষণা করিয়াছেন। অথচ যখনই তাঁহাদের মুক্তির দাবী করা হয় তখনই গভর্ণমেণ্ট "সন্ত্রাসবাদী" আখ্যা দিয়া ব্যাপারটি ধামা চাপা দেন। অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট সাধ্যমত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়াছে ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলায় কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া ১৯৩৭-১৯৩৯ সালে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। সেইজন্য রেড এড কমিটি সাধারণ ভাবে অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক

বন্দী ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবীর জন্য বিশেষভাবে আন্দোলন চালাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

মুজফ্ফর আমেদ আরো বলেন :-সত্যকারের দেশকর্ম্মী ও দেশপ্রেমিক বাঙ্গলার এই ৭২ জন সুসন্তানের মধ্যে শ্রীযুক্ত অম্বিকা চক্রবর্ত্তী তাঁহার ৫৩ বৎসর জীবনের মধ্যে ২৬ বৎসরকাল কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কাটাইয়াছেন। উক্ত ৭২ জন রাজ-নৈতিক বন্দীর মধ্যে শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অনন্ত সিংহ প্রমুখ ৩৮ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডভোগ করিয়াছেন। বৃটিশ আইনে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বলিতে ১৪ বৎসর দণ্ডভোগ বুঝায়। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত সাধারণ কয়েদীদেরও ১৪ বৎসর পরে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু এই সমস্ত দেশপ্রেমিকের মধ্যে ২১ জনের দণ্ডভোগের মেয়াদ ১৪ বৎসর অতিক্রম করিলেও তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া হয় নাই। ৫ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর কাল পর্য্যন্ত দণ্ডিত ২৮ জন রাজনৈতিক বন্দী পূর্ণদণ্ডকাল ভোগ করার পর তাঁহাদের মুক্তির একটা প্রহসন করা হয় এবং মুক্তিদান করিয়া জেল-গেটে পুনরায় ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক করা হয়।

রাজনৈতিক বন্দীদের প্রায় সকলেই নানাবিধ রোগে ভুগিতেছেন এবং কয়েকজন মরণাপন্ন হইয়াছেন। প্রায় সমস্ত বন্দীর ওজন অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ক্ষয়, এপেনডিসাইটিস, বহুমূত্র দৃষ্টিহীনতা রোগে ভুগিতেছেন। শ্রীযুক্ত অনন্ত সিং হাঁপানী রোগে; শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষ হৃদ্‌রোগে; শ্রীযুক্ত লোকনাথ বল রক্তের চাপ ও হৃদরোগে; শ্রীযুক্ত কালী চক্রবর্ত্তী কর্ণ, দন্তরোগ ও আমাশয় রোগে ভুগিতেছেন। শ্রীযুত প্রিয়দা চক্রবর্ত্তীর হাঁপানী রোগ দাঁড়াইয়াছে। শ্রীযুত সুনীল চ্যাটার্জ্জি অনিদ্রা রোগে, শ্রীযুত রমেশ চ্যাটার্জ্জি দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাশয় রোগে, শ্রীযুত শচীন করগুপ্ত অর্শ ও হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছেন। শ্রীযুত সুরেন করের মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়াছে। শ্রীযুত পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত হৃদ্‌রোগ ও অর্শরোগে ভুগিতেছেন। ঢাকা জেলে আবদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা শোচনীয়। উক্ত জেলে আবদ্ধ সমস্ত বন্দীর দেহের ওজন কমিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন বন্দীর ওজন ৩০ পাউণ্ড কমিয়াছে।

উপরোক্ত ৭২ জন দেশের সুসন্তান ও সর্ব্বত্যাগী সাধকের মুক্তি আন্দোলনের জন্য এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া একটি 'সর্ব্বদলীয় কমিটি' গঠিত হয়ঃ মিঃ জে সি গুপ্ত, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মোয়াজ্জেম হোসেন (লালমিঞা), হাসান আলি চৌধুরী, বসন্তলাল মুরারকা, মদনলাল মিশ্র, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ডাঃ নারায়ণ রায়, মুজফ্ফর আহমদ, হীরেন মুখার্জ্জি, স্নেহাংশু আচার্য্য ও নিরঞ্জন সেন।

জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির সহযোগিতা

এই সম্মেলনের পর হইতে যুগান্তর, বসুমতী, অমৃতবাজার পত্রিকা প্রমুখ সমস্ত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাই এই সব বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নকে বাংলার জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরে। সাংবাদিক সম্মেলনে কলিকাতার প্রধান প্রধান প্রত্যেকটী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত প্রেস এই ব্যাপারে যতখানি সাড়া দিয়াছে তাহা খুবই উৎসাহপ্রদ। অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, যুগান্তর ও বসুমতী এই আন্দোলনে সম্পদকীয় সমর্থন জানাইয়াছে এবং প্রায় সমস্ত কাগজেই সাংবাদিক সম্মেলনের খবরটি ভালভাবে ছাপান হইয়াছে।

সাপ্তাহিক অরণিতে ৮ই জুনের সম্পদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয়ঃ "বিলাতী নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বযুদ্ধের যোদ্ধারা ভারতকে অনেক আশার বাণী শুনাইতেছেন। লর্ড ওয়েভেল পরিবর্ত্তিত জগতের নূতন আশার বাণী লইয়া ভারতে ফিরিয়াছেন। ভারতের দীর্ঘস্থায়ী অসন্তোষ ও অবিশ্বাসের একটী স্থায়ী সমাধানের জন্য নাকি সকলেই আগ্রহশীল। এই অবস্থার মধ্যে আমরা বাংলার দুঃখব্রতী কারারুদ্ধ সন্তানদের কথা নূতন করিয়া ভাবিতেছি। আরো ভাবিতেছি, বাংলার বুক হইতে এই বেদনাশল্য অপসারিত করিবার কথা গভর্ণর মিঃ কেসী ও তাঁহার পরামর্শ-দাতারা ভাবিতেছেন কি না? যাঁহারা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন এবং যাঁহারা সাধারণ আইনে নহে, বিশেষ ফৌজদারী আইনে স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালী দ্রুত

বিচার-পদ্ধতিতে "আদর্শদণ্ডে" দণ্ডিত হইয়াছেন—তাঁহাদিগকে পুলিসী প্রতিহিংসা হইতে মুক্তি দেওয়া কি "বৃটিশ সুবিচারের" নির্দ্দেশ নহে ? মিঃ কেসী উত্তমরূপেই অবগত আছেন, চট্টগ্রাম বন্দীসহ অনেকে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধে যোগদানের জন্য নিজেরা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং দেশবাসীকে আবেদন জানাইয়াছিলেন। বাংলার চরমতম দুর্দ্দিনে দুর্ভিক্ষ মহামারী হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিতে অপটু আমলাতন্ত্র কি মনে করেন যে ভগ্নস্বাস্থ্য, দীর্ঘকাল কারাদণ্ডে জর্জ্জরিত এই সকল দেশপ্রেমিককে মুক্তি দিলে অবস্থা আরও সঙ্গীন হইবে ? বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থার সুযোগ লইয়া যদি মিঃ কেসী এই সকল বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি বিধান করেন, তাহা হইলে বাংলার রাজনৈতিক জীবনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে। রাষ্ট্রধর্ম্মে দয়াদাক্ষিণ্যের স্থান না থাকিলেও কূটনীতির দিক হইতে বন্দী-মুক্তি-বিধান শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের মধ্যে অনেক তিক্ততা দূর করিবে। মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পর নূতন নির্ম্মাণের কাজের সূচনায় ইতিহাসের অতীত অধ্যায়ের জের টানিয়া চলা শুভকাজে বাধা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু নহে।"

* * *

১৫ই জুন **"যুগান্তর"** পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয় :

"ভারতের অচল অবস্থা সচল করার সুযোগ দিবার জন্য লর্ড ওয়েভেল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ কর্ম্মীদের মুক্তি ঘোষণার ভার তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করেন নাই। প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের বিবেচনার উপর তাঁহাদের ভাগ্য ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। অবশ্য এই ঘোষণার পরে এক দলকে মুক্তি দেওয়া হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে যে সকল রাজনৈতিক বন্দী জেলে রহিয়াছেন অথবা দীর্ঘকাল দণ্ডভোগ করিয়া মুক্তি পাওয়ামাত্রই যাঁহারা সিকিউরিটী বন্দী হইয়াছেন, তাঁহাদের মুক্তি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কি করিবেন, তাহা এখন কিছুই বুঝা যাইতেছে না।.........

"কর্তৃপক্ষ অবশ্যই জানেন যে রাজনৈতিক কোন মীমাংসা বা আপোষের পূর্ব্বে সকল প্রকার রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহ কত ঐকান্তিক,

অথচ লর্ড ওয়েভেলের ঘোষণা পড়িয়া এ ব্যাপারে এবারেও যে কোন অকুণ্ঠ উদার নীতি অবলম্বিত হইবে এরূপ কোন সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায় নাই।.........

"রাজনৈতিক আপোষ মীমাংসা সম্ভব করিতে হইলে, অচল অবস্থা সচল করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক বন্দীরই মুক্তি দেওয়া আবশ্যক। লর্ড ওয়েভেল বলিয়াছেন, উভয় পক্ষ হইতেই অনেকগুলি বিষয় ভুলিয়া যাওয়া এবং ক্ষমা করার প্রয়োজন আছে। রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কেও নিশ্চয় সে প্রয়োজন নিঃশেষ হয় নাই।"

* * *

৩রা জুন **"বসুমতী"**র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বাংলার বিস্মৃত দেশপ্রেমিকগণকে অবিলম্বে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য এক উদাত্ত আহ্বান জানান হয়। এই প্রবন্ধের কিয়দংশ আমরা নীচে তুলিয়া দিলাম :

"গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং প্রমুখ বাঙ্গালার বীর দেশপ্রেমিক যুবকগণ একদিন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে রাজনৈতিক রূপকথার নায়ক ছিলেন, আজও আছেন। আজ তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের অমরা কি করিয়া এমনভাবে ভুলিয়া গেলাম জানি না। সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত এক একজনের কারাবাসের কথা চিন্তা করিলে আজ মনে হয়, একদিন এই সোণার বাঙ্গালার যে সোণার তরুণের দল শৃঙ্খলিতা, নির্য্যাতিতা, পরাধীন দেশমাতার পদতলে দাঁড়াইয়া নবীন তারুণ্যের প্রত্যুষে বাঙ্গালার আকাশে স্বাধীনতার রক্তিম অরুণোদয়ের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, আজ তাহারা লৌহ গরাদের অন্তরালে সকলের দৃষ্টির অগোচরে যৌবনের সায়াহ্নে আসিয়া পৌঁছিল, তবু দেশের সবুজ, শ্যামল ক্ষেত ও মাটি দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট কঙ্কাল দেখিবার সৌভাগ্য আজও তাহাদের হইল না। আজও তাহাদের চারিদিকে অন্ধকার অচলায়তন, আজও তাহাদের সম্মুখে সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান, হাতে-পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী। খুনী, চোর, ডাকাত, ব্যাভিচারী ও প্রতারকদের অপরাধের জন্য যে শাস্তি হয়, সে-শাস্তিরও সীমা আছে। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করিতে পারি কি বাঙ্গালার এই সর্ব্বজন-আদরণীয় নির্ভীক দেশপ্রেমিকগণ আজও পর্য্যন্ত এমন কি অপরাধে অপরাধী হইয়া আছেন, যাহার জন্য তাঁহাদের সারাজীবন বন্দী নিবাসে থাকিয়া তিলে তিলে প্রাণ বিসর্জন

দিতে হইবে ? এই দেশপ্রেমিকদের প্রতি দেশবাসীর কি কোন কর্ত্তব্য নাই ? ইহাদের জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় দেশের মুক্ত মাটিতে ফিরাইয়া আনা কি দেশবাসীর দায়িত্ব নয় ? দায়িত্ব কঠিন, কর্ত্তব্য কঠোর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে যদি আমরা এড়াইয়া বা ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ ইতিহাস ও বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ বংশধররা কি কোনদিন আমাদের শ্রদ্ধা করিবে, ক্ষমা করিবে ?

"আজ তাই আমরা দেশবাসীর নিকট বাঙ্গালার এই বিস্মৃত বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন করিবার জন্য আবেদন করিতেছি। রাজনৈতিক দল ও মতামত নির্বিশেষে সকলে একত্র হইয়া আজ এই কঠোর কর্ত্তব্য পালনের জন্য অগ্রসর হউন। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, এই বন্দীদের মুক্তি সমস্যাকে সর্ব্বভারতীয় এক বিরাট আন্দোলনে রূপ দিবার জন্য ১৯৩৯ সালের মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। আজ সেই প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিবার দিন আসিয়াছে। আজ আমাদের দেশে বেল্‌সেন্‌ ও বুশেন্‌ওয়াল্ডের নাৎসী বন্দী নিবাসের মর্ম্মস্পর্শী চিত্র প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু আজ যদি আমরা প্রশ্ন করি, বাঙ্গালা দেশের এই বন্দীদের সম্পর্কে আজও যে নীতি অনুসৃত হইতেছে তাহা কোন্ দেশীয় গণতন্ত্রের আদর্শ-অনুমোদিত, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ কি উত্তর দিবেন ? নাৎসীবাদের বর্ব্বরতা আমরা আন্তরিক ঘৃণা করি, কিন্তু যে সাম্রাজ্যবাদীদের মানবতার বিচারবোধ নাই তাহাদের আমরা ভুলিয়াও কোন দিন শ্রদ্ধা করি না। তাঁহাদের নিকট আজ আমরা করুণভাবে আবেদন করিতেছি, অন্ততঃ মানবতার সম্মান রক্ষার জন্য বাঙ্গালা দেশ হইতে এই দ্বিতীয় বেল্‌সেন্‌ ও বুশেনওয়াল্ড তুলিয়া দেওয়া হউক। তাহাতে মানবতার জয় হইবে এবং বহু বিঘোষিত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার অদর্শেরই জয় হইবে।"

* * *

এই সমস্ত বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন কত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইঁহাদের মুক্তির জন্য গণ-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তাহা ৭ই জুনের "জনযুদ্ধ" পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পরিস্কার ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিল। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটী নীচে উদ্ধৃত করা হইল :

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী মামলায় যাঁহারা দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন, কোনো বাঙ্গালীই তাঁহাদের কথা ভুলিতে পারেন না। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি নাম বাঙ্গালী জাতির দেশপ্রেমের অনুভুতিতে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত আছে।

তাঁহারা প্রায় সকলেই ১৯৩০ বা তাহার কাছাকাছি সময় কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ৭২ জন এই সুদীর্ঘকাল কারাবাসের পরও মুক্তি পান নাই। সরকারী নিয়ম অনুসারে যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীরা, এমন কি চোর-ডাকাতেরাও, সাধারণতঃ ১৪ বৎসর দণ্ডভোগের পর মুক্তি পাইয়া থাকে। কিন্তু এই বন্দীদের মধ্যে ২১ জনের ১৪ বৎসর মেয়াদ পার হইয়া গিয়াছে তবুও তাঁহারা মুক্তি পান নাই। আরও ২৮ জন সম্পূর্ণ দণ্ডাজ্ঞা শেষ করিয়াছেন, কিন্তু মুক্তির পর তাঁহাদিগকে জেলের দুয়ারেই গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে।

দীর্ঘ কারাবাসের ফলে ইঁহাদের অনেকেরই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর অবস্থা সম্বন্ধে সম্প্রতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক খবর আসিয়াছে। ৫৩ বৎসর জীবনের মধ্যে ২৬ বৎসরই তিনি জেলখানায় কাটাইয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য এত খারাপ যে ১৯৩৯ সালে গভর্ণমেণ্ট নিয়োজিত পরামর্শ কমিটিও তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিবার সুপারিশ করিয়াছিল। কিন্তু সে সুপারিশ গবর্ণমেণ্ট মানে নাই। সম্প্রতি শোনা যাইতেছে তাঁহার রক্ত এমন দূষিত হইয়াছে যে, যে-কোনো সময়ে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। সমস্ত দেশবাসী একসঙ্গে মিলিয়া অবিলম্বে তাঁহার মুক্তির জন্য চেষ্টা না করিলে হয়তো তাঁহাকে হারাইতে হইবে।

এক অস্বাভাবিক রাজনীতিক অবস্থার মধ্যে বিশেষ আইনকানুন ও স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালের সাহায্যে ইঁহাদের কঠোরতম সাজা দেওয়া হইত। সাধারণতঃ যেখানে কাহারও কাছে একটি পিস্তল পাইলে মাস ছয়েক সাজা হয়, সেখানে ইঁহাদের অনেকের পাঁচ, সাত বৎসর সাজা হইয়াছে। জুরীর বিচারের অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। সেই ধরণের রাজনীতিক অবস্থা বহুদিন হইল গত হইয়াছে, তাহা শাসক সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন। তবুও

তাঁহাদিগকে এই অস্বাভাবিক সাজাই ভোগ করিয়া চলিতে বাধ্য করা হইতেছে। যাঁহারা সাজা শেষ করিয়াছেন তাঁহারা পর্য্যন্ত মুক্তি পান নাই।

যে-পথে দেশের স্বাধীনতা আসিবে ব'লিয়া তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন সে পথ ভ্রান্ত তাহা বহুদিন আগে তাঁহারা নিজেরাই উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা জেলের মধ্যেও মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিয়াছেন। কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয় গণ-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা যাচাই করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, সন্ত্রাসবাদী কর্ম্মপদ্ধতি নয়, ঐক্যবদ্ধ জাতীয় গণ-আন্দোলনই মুক্তির একমাত্র পথ। তারপর সোভিয়েট ইউনিয়নে সাম্যবাদের বিজয়যাত্রা, দেশ বিদেশে শ্রমিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনের ক্রমবর্দ্ধমান সংগ্রাম তাঁহাদের অধিকাংশের মনেই আরও গভীর পরিবর্ত্তনের সূচনা করে, তাঁহারা কমিউনিজম ও কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অনুরাগী হইয়া দাঁড়ান।

জাতির শ্রেষ্ঠ নেতা গান্ধীজীর কাছে প্রকাশ্য বিবৃতিতে সন্ত্রাসবাদী পথের ভ্রান্তি তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। গান্ধীজী নিজেও বলিয়াছেন যে, এই বন্দীরা সন্ত্রাসবাদী পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

ইঁহাদের সন্ত্রাসপন্থা ভ্রান্ত ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া জাতীয় আন্দোলনে ইঁহাদের দান সামান্য নয়। কংগ্রেসী আন্দোলন এবং ইঁহাদের আত্মত্যাগ এই দুইয়ের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিগুলি সমন্বিত হইয়াই বাঙ্গালীর জাতীয় সংগ্রামের মহান্ ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেস হইতে বাঙ্গালী পাইয়াছে জনগণের দাবী ও সেবা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সকল মানুষের ঐক্য, জাগ্রত জনশক্তির বিরাট অভ্যুদয়; আর ইঁহাদের কাছে পাইয়াছে, আপোষহীন সংগ্রামচেতনা, নিঃশঙ্ক বীরত্ব, কঠোর আত্মত্যাগ, সুসংহত সংগঠন, অনির্ব্বাণ দেশপ্রেম। এই দুইয়ে মিলিয়াই বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস।

সে কথা কংগ্রেসও ভুলিতে পারে নাই, তাই বারে বারে ইঁহাদের মুক্তির জন্য দাবী করিয়াছে। শাসক সম্প্রদায়ের রূঢ় প্রত্যাখ্যানে গান্ধীজীর সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইল তখন ১৯৩৯ সালের মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিল :

"বাংলা ও পাঞ্জাবের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি-সমস্যাকে সর্ব্বভারতীয় বিরাট এক আন্দোলনের রূপ দিবার সঙ্কল্প নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই বৈঠক গ্রহণ করিতেছে।"

কংগ্রেসের সে সঙ্কল্প আজও পূর্ণ হয় নাই। ইতিমধ্যে যুদ্ধ আসিয়াছে, বিপর্য্যয় আসিয়াছে, অসহ্য নির্য্যাতন ও সহস্র ভ্রান্তিতে জাতীয় আন্দোলনে অচল অবস্থা আসিয়াছে। কারাপ্রাচীরের অন্ধকারে থাকিয়াও এই বীর বন্দীরাই জাতীয় আন্দোলনের উজ্জ্বল ঐতিহ্যকে দেশবাসীর কাছে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত সাধারণ মানুষের যে সংগ্রাম তাহাতে শরীক হইয়া দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার জন্য ডাক দিয়াছেন।

অনেক দেশভক্ত ভাবিয়াছেন এই যুদ্ধে যোগদানের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন-মুক্তি কোথায়? কিন্তু স্বয়ং সাম্রাজ্যবাদ বন্দীদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে সেই বন্ধনমুক্তির আভাষ দেখিয়াই সন্ত্রস্ত হইয়াছে, কিছুতেই তাঁহাদিগকে জনগণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতে দেয় নাই।

জাতীয় আন্দোলনও আপন ভ্রান্ত উত্তেজনায় মগ্ন থাকিয়া ইঁহাদের কথা সাময়িক-ভাবে বিস্মৃত হইয়াছে। তারপর রাজনীতিক ব্যর্থতা ও হতাশার সর্ব্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে ইঁহাদের মুক্তি আন্দোলনের সম্ভাবনাও কিছুতেই স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পায় নাই। দেশভক্ত ভাবিয়াছেন—সমস্ত ভারতই তো কারাগারে বন্দী, ইঁহাদের মুক্তির দাবী কে তুলিবে, কে শুনিবে? এমন কি ইঁহাদের মুক্তির দাবীতে স্বাক্ষর করিতেও কোনো কোনো বিখ্যাত দেশভক্ত রাজী হন নাই। আমলাতন্ত্রও এই দুর্ব্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছে, মরণাপন্ন অসুস্থ বন্দীকেও মুক্তি দেয় নাই।

ভারতবর্ষ কারাগারে বন্দী বটে, কিন্তু বিশ্বব্যাপী জনসাধারণের আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ তাহার প্রাচীরগাত্রে অবিরাম আঘাত করিতেছে। আমাদের নিজেদের চেষ্টা তাহার সহিত যতই যুক্ত হইতেছে কারামুক্তির সম্ভাবনাও ততই নিকট হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতার উপযুক্ত শক্তি যদি সঞ্চিত নাও হয়, অন্ততঃ আমাদের দেশনেতাদের মুক্ত করিয়া আনিতে পারিব এ ভরসা ক্রমেই দেশের লোকের মনে জাগিতেছে।

কিন্তু তবুও এই বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি না হইতে পারে। বাংলা দেশের দেশভক্ত নরনারীর উপর এই বন্দীদের অপরিসীম প্রভাব এবং তাঁহাদের অসীম কর্ম্মক্ষমতার কথা আমলাতন্ত্র ভাল করিয়া জানে—সেজন্য সন্ত্রাসবাদের মিথ্যা অজুহাত তুলিয়া তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়াই রাখিতে চাহিবে। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া গণ-আন্দোলনের শীর্ষে দাঁড়াইলে বাংলার জাতীয় আন্দোলন নূতন শক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, দুর্ভিক্ষবিক্ষত বাংলার প্রাণে নূতন স্পন্দন জাগিয়া উঠিবে—ইহা জানে বলিয়াই আমলাতন্ত্র তাঁহাদের বন্ধ করিয়া রাখিতে চাহিতেছে।

আর ঠিক সেই কারণেই বাংলার জাতীয় আন্দোলনের কাছে ইঁহাদের উপস্থিতি এই মুহূর্ত্তে সব চেয়ে জরুরী প্রয়োজন। আমলাতন্ত্রের বাধা ভাঙ্গিবার জন্য বাংলার সমস্ত নেতা, সকল নরনারী একত্রে দাঁড়াইলে সে প্রয়োজন পূর্ণ হইবে। এই চেষ্টার উদ্দেশ্যে কয়েকজন বিখ্যাত নেতার নেতৃত্বে সম্প্রতি একটী আন্দোলন-কমিটি গঠিত হইয়াছে। বাংলা দেশ আশা করে, প্রত্যেকটী দেশভক্ত ইঁহাদের মুক্তি আন্দোলনে সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইবেন।

সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সমর্থন

বাংলার ৩৩ জন বিশিষ্ট শিল্পী বন্দীমুক্তি আন্দোলনে অগ্রণী হইয়া আসেন এবং জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এই সব বীর স্বদেশভক্তদের মুক্তির জন্য সর্ব্বভারতীয় আন্দোলনের আহ্বান জানান। তাঁহাদের বিবৃতিটি নীচে দেওয়া হইল :

বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনেরই অংশ। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিপ্লবী নেতার নাম প্রত্যেক বাঙ্গালী শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। জাতীয় আন্দোলনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের প্রত্যেকেই সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, দেশবাসীর কাছে সে ঘোষণা অজ্ঞাত নয়। জীবনের শেষ সময় এই দেশপ্রেমিকরা দেশবাসীর চক্ষের ও মনের অন্তরালে ভগ্নস্বাস্থ্য ও ভগ্নমন নিয়া কারাপ্রাচীরের মধ্যে মৃত্যুপথযাত্রী। দেশবাসীর আকুল প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করে নাই। আজকে দেশের ও জাতির চরম সংকটের দিনে

তাঁহাদের উপস্থিতি ও নেতৃত্ব জাতির মনে আশার সঞ্চার করিবে একথা আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। বন্দীরা প্রায় সকলেই কোন না কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। অনেকের নির্দ্দিষ্ট দণ্ডকাল শেষ হইয়া গিয়াছে। এই দেশপ্রেমিকদের মুক্তি আন্দোলন সর্ব্বভারতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করুক—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন ঃ

চিত্রশিল্পী—যামিনী রায়, জয়নুল আবেদীন, নীরদ মজুমদার, শুভো ঠাকুর, সূর্য্য রায়, প্রদোষ দাশগুপ্ত, রথীন্দ্র মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল, সত্যেন ঘোষাল, বংশীলাল চন্দ্র প্রসাদ, ফণীভূষণ দাস, নমিতা সাহা, পরিতোষ সেন।

নাট্যশিল্পী—অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, শৈলেন চৌধুরী, নরেশচন্দ্র মিত্র, রঞ্জিত রায়, প্রভাত সিংহ, বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, জীবেন বসু।

সুরশিল্পী—কমল দাশগুপ্ত, সন্তোষ সেনগুপ্ত, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুখেন্দু গোস্বামী, জগন্ময় মিত্র, গৌর ঘোষ, রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিমল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, অর্দ্ধেন্দু ঘোষ।

খ্যাতনামা সাহিত্যিকরাও এই আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান লইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দীমুক্তি আন্দোলনে জনসাধারণকে সচেষ্ট হইবার জন্ত একটী বিবৃতিতে লেখেন ঃ "তথাকথিত শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনেরও পূর্ব্বে দেশের জন্ত যেসব দেশপ্রেমিক কারাবরণ করেছিলেন এবং আজও যাঁরা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে সেই জীবন কাটাচ্ছেন তাঁরা দেশের মহান্ সম্পদ। মুক্তি সাধনায় প্রেরণার এঁরা জীবন্ত উৎস। এঁদের কথা ভুলে গেলে সেটা জাতিরই কলঙ্ক হবে। আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য এ বিষয়ে সজাগ থাকা, যাতে এ কলঙ্কের ছাপ মাত্র যেন জাতির নাম স্পর্শ না করতে পারে।"

সুখ্যাতা লেখিকা শ্রীপ্রভাবতী দেবী স্বরস্বতী বলেন,—"যাঁহারা বর্ত্তমানে আজও কারাগারে রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধীভাবে আবদ্ধ হইয়া আছেন, আমি তাঁহাদের মুক্তি কামনা করি।"

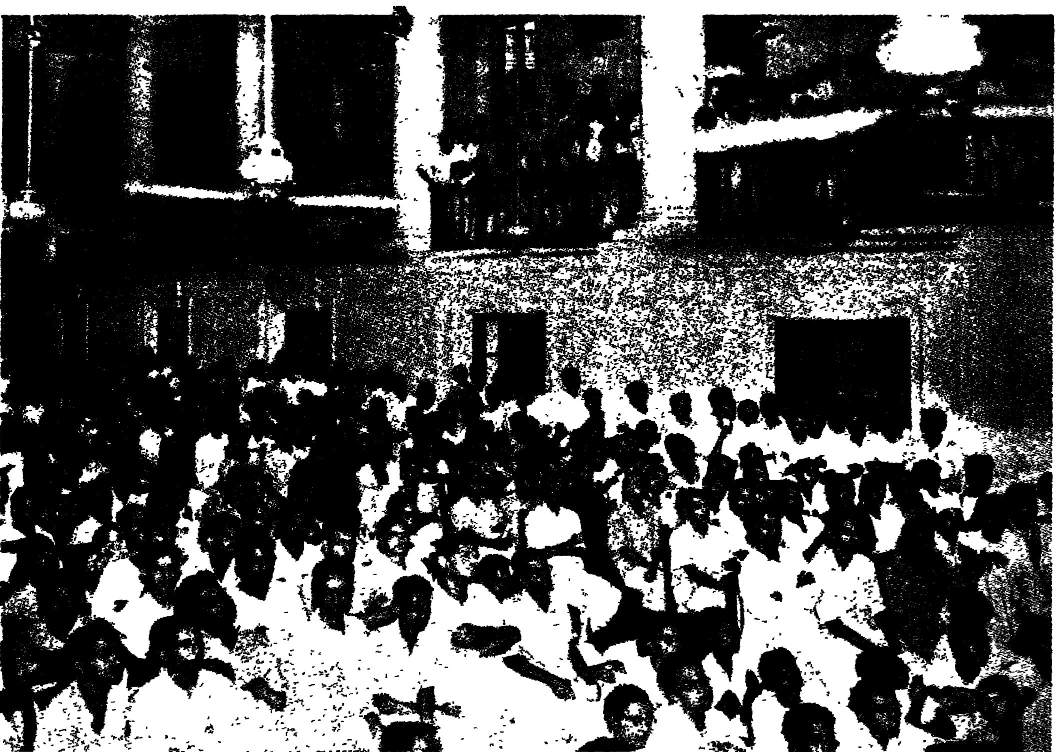
শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের আওয়াজ

১৭ই জুন কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন হয়। দশহাজার শ্রমিকের ও বাংলার বিভিন্ন শিল্পের প্রতিনিধিদের এই সম্মেলন সর্ব্বসমতিক্রমে ইঁহাদের মুক্তি দাবী করে। প্রস্তাবে বলা হয়, নয়া শাসন সংস্কারের পুর্বেকার দিনের রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক।

* * *

৫ই জুলাই কলিকাতার নাগরিকদের একটী সভা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্ হলে অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র, শ্রমিক, নারী এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিপুল সংখ্যায় এই সভায় যোগদান করেন। সভাগৃহ জনসমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দ্বারদেশে, অলিন্দে ও প্রাঙ্গণে তিল ধারণের স্থান ছিল না। সম্মুখের রাজপথে শত শত শ্রোতা বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সভায় শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার প্রেরিত পত্র পাঠ করার পর শ্রীযুক্ত জে সি গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার বাণীতে ছিল: "জীবিত কালে আমার স্বামী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিয়াছেন। তখন হইতে আমিও কি আইন সভার ভিতরে কি বাহিরে ইঁহাদের মুক্তি দাবী করিয়া আসিতেছি। এখনও এমন অনেক বন্দী জেলে আছেন যাঁহারা আজ মুক্তিলাভ করিলে দেশের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি দিতে পারেন।" শ্রীযুক্ত সত্যেন মজুমদার, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন এম-এল-এ, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এম-এল-এ, শ্রীযুক্ত সোমনাথ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কে পি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মদনলাল মিশ্র প্রভৃতি বহু বক্তা সভায় বক্তৃতা করেন এবং সকলের বক্তৃতাতেই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী প্রতিধ্বনিত হয়। [illegible] প্রস্তাব বিপুল উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত হয়।

প্রথম: "কলিকাতার নাগরিকদের এই সভা অবিলম্বে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিতেছে। যাঁহারা রাজনৈতিক কারণে কারাদণ্ড ভোগ কবিতেছেন, যাঁহারা বিনাবিচারে আটক আছেন এবং



কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে ৫ই জুলাই ১৯৪৫ মুক্তির দাবীতে জনসভা



কলিকাতার বন্দীমুক্তি জনসভার একাংশ

বিশেষতঃ শাসন-সংস্কারের পূর্ব্ববর্ত্তী যেসকল তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী বন্দী দণ্ডভোগকাল উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আটক আছেন, বাঙ্গলার যে বিস্মৃত বন্দীদের ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের অনশন ধর্ম্মঘটের সময় দেশের জনগণের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশ্বাস বাণী দিয়াছিলেন যে তাঁহারা উক্ত বন্দীদের কারামুক্ত করার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবেন, তাঁহাদের মুক্তির জন্য এই সভা দাবী করিতেছে। এই সকল বন্দী বর্ত্তমানে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করেন না তাহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন, ঐ সকল বন্দীদের অনেকের দণ্ডভোগ কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও বহু বৎসর নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আটক আছেন এবং অধিকাংশ বন্দীর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; তথাপি তাঁহাদের মুক্তিদান না করায় এই সভা আমলাতান্ত্রিক সরকারের তীব্র নিন্দা করিতেছে।"

দ্বিতীয় : "এই সভা সমগ্র ভারতে বিশেষ করিয়া বাংলার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন চালাইয়া তাঁহাদের মুক্তি দিতে আমলাতান্ত্রিক সরকারকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আহ্বান জানাইতেছে।

"এই সভা জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি অনুরোধ জানাইতেছে যে, তাঁহারা যেন এই সকল বিস্মৃত বন্দীদের মুক্তির জন্য সচেষ্ট হন, কারণ ভারতের অচল অবস্থার সমাধান কার্য্যে ইঁহাদের সহায়তা লাভ করিয়া তাঁহারা আরো শক্তিশালী হইতে পারিবেন।"

সভা হইতে সিমলায় জাতীয় নেতাদের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য একটি প্রতিনিধিমণ্ডলী নির্ব্বাচিত করা হয়—শ্রীযুত জে, সি, গুপ্ত, শ্রীযুত কে, পি, চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত স্নেহাংশু আচার্য্য, শ্রীযুত নিরঞ্জন সেন এবং পাঞ্জাব হইতে একজন প্রতিনিধি।

* * *

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির এক সভায় রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে তাঁহারা দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দীদের মুক্তির কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করেন।

২১শে জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিসান কাউন্সিলের সভায় সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনে ধৃত বন্দীদের মধ্যে এখনও যে ৭২ জন বন্দী বাংলার বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ রহিয়াছেন তাঁহাদের ও অন্যান্য বন্দীদের আশু মুক্তি দাবী করা হইয়াছে। যতদিন না তাঁহারা মুক্ত হন ততদিন সমস্ত দেশবাসীকে এবং বিভিন্ন দেশভক্ত রাজনৈতিক দলকে এই সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন করিতে অনুরোধ করিয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কংগ্রেস-নেতাদের আন্তরিক সমর্থন

সিমলাতে সমবেত জাতীয় নেতাদের সামনে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী পেশ করার জন্য ১০ই জুলাই প্রতিনিধিমণ্ডলী (ডেপুটেশন) কলিকাতা হইতে রওনা হয়। অধ্যাপক ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটেশনে যাইতে না পারায় অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়ের যাওয়া স্থির হয়। জাতীয় নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত ডেপুটেশনের বক্তব্য শ্রবণ করেন। তাঁহারা বলেন,—সদাসর্ব্বদা এই সব বন্দীর কথা তাঁহাদের চিত্তে বেদনার সঞ্চার করিতেছে। তাঁহারা প্রতিশ্রুতি দেন যে ইঁহাদের মুক্তির জন্য তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবেন। অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় নিজে এই ডেপুটেশনের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন তাহা পড়িলেই বুঝা যাইবে যে, জাতীয় নেতারা এই সব বন্দীদের মুক্তির জন্য কত বেশী আগ্রহশীল। সেই বিবরণটী এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :

১০ই জুলাই আমরা রওনা হই। সিমলা বৈঠক যে ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে এ আশঙ্কা তখনই অনেকের মনে জেগেছিল। কংগ্রেস আর লীগের মধ্যে একটা বোঝাবুঝি হয় নি, হওয়ার আশাও যেন মিলিয়ে আসছিল। বড়লাটের হাতেই বৈঠকের সাফল্যের চাবিকাঠি রয়ে গেল। বাইরে দুঃখ প্রকাশ করলেও নিশ্চয়ই মনে মনে বেশ একচোট হাসি হেসে নিয়ে বড়লাট ওয়াভেল ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত বৈঠক মুলতুবী রেখে দিয়েছিলেন। আলাদা-আলাদাভাবে কংগ্রেস আর লীগ (ও অন্যান্য দল) বড়লাটের কাছে নতুন সরকার গঠনের জন্য তালিকা পেশ করবে,

এই ছিল ব্যবস্থা। আমরা রওনা হওয়ার আগে খবর আসে যে বড়লাটের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সন্তুষ্ট না হওয়ার ফলে লীগ তার পক্ষ থেকে কোনও নামের তালিকা দেবে না। কংগ্রেস বলছে, দরকার হ'লে লীগকে বাদ দিয়েই বড়লাট শাসন-পরিষদ গঠন করুন। সুতরাং অবস্থাটা তখন বেশ জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতা থেকে সিমলা অনেকটা পথ। লম্বা পাড়ি দেবার সময় আমরা চারজন এই সব বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবার অনেক সুযোগ ও সময় পেলাম। বিশেষ করে কংগ্রেস নেতা জে-সি-গুপ্তের সঙ্গে সিমলা বৈঠক সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা হতে পারল। কংগ্রেস আর লীগের মধ্যে বোঝাপড়া যে নিতান্ত দরকার আর মিটমাট না হলে তার ফল যে দেশের পক্ষে একেবারে বিষময়, তা তিনি খুব জোর ক'রেই বললেন।

রাজনৈতিক আকাশের ঘোরালো অবস্থা

বারো তারিখে প্রায় দুটো নাগাদ আমরা সিমলা পৌঁছালাম। হাওড়া ষ্টেশন থেকেই মওলানা আজাদ আর গান্ধীজীর কাছে আমরা তার পাঠিয়েছিলাম। কখন তাঁদের সময় হবে তা সেদিনই ঠিক জেনে নেবার চেষ্টায় আমরা বেরোলাম। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে, বিষণ্ণ মেঘ সর্ব্বদা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবহাওয়াতেই যেন অবসাদের একটা বোঝা চেপে রয়েছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে গুপ্ত সাহেব গেলেন গান্ধীজী আর মওলানা আজাদের ডেরা 'ম্যানরভিল' আর 'আর্মসডেলের' দিকে। তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের বড়কর্ত্তা সকলেরই হৃদ্যতা। কলকাতায় গুপ্ত সায়েবের বাড়ীতে খানা খান নি বা দু'চারদিন বাস করেন নি, এমন কংগ্রেস নেতা বিরল। তাই সাধু-সদনে তাকে পাঠিয়ে আমরা চললাম ডেভিকোর' চা-খানার দিকে। সেখানে পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মিঞা ইফ্‌তিখারউদ্দীনের কাছে খবরাখবর পাওয়া যাবে।

পথে প্রথম চেনা মুখ দেখলাম কলকাতার এক অধ্যাপকের (হুমায়ুন কবীর—সঃ)। ইনি হরেক রকমের রাজনীতি ক'রে থাকেন,

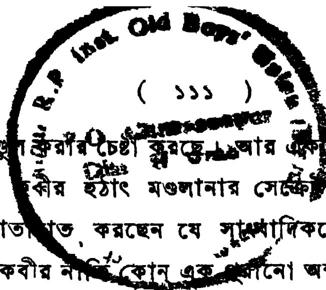
যখন যেমন দরকার তেমনই নরম-গরম বুলি আউড়ে থাকেন, আর কংগ্রেসে যোগ না দিলেও হঠাৎ কোন এক তাজ্জব কায়দায় মওলানা আজাদকে পাহারা দেওয়ার কাজ বাগিয়ে ফেলেছেন। বলাই বাহুল্য যে আমাদের উপর তিনি একেবারেই প্রসন্ন নন। যাই হোক, স্নেহাংশু স্নেহাংশুই একজন মহারাজকুমার, তাই স্নেহাংশুকে খুব সাদর সম্ভাষণ করা ছাড়া তিনি আর বিশেষ আমাদের আমল দিতে চাইলেন না। বুঝলাম যে পায়া ভারী হয়েছে, আর দুশ্চিন্তা হ'ল যে গুপ্ত সাহেব একটা ব্যবস্থা না করলে হয়তো এই মহারথীটি মওলানা আজাদের সঙ্গে আমাদের মোলাকাৎ পণ্ড করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন।

বেশ চড়াই রাস্তায় চলেছি ; হঠাৎ দেখা হয়ে গেল "পীপল্‌স ওয়ারের" প্রতিনিধি কমরেড চারির সঙ্গে। একটু ফুরসুৎ পাওয়া গেল ; পাহাড়ে হাওয়াতে মুহূর্ত্তেই ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।

"ডেভিকোতে" ইফ্‌তিখারের দেখা পেলাম, সঙ্গে পাঞ্জাবের ছাত্র-আন্দোলনের একজন ভূতপূর্ব্ব নেতা। ইফ্‌তিখার খুবই মনমরা অবস্থায় রয়েছে দেখলাম ; বহুবার সে কংগ্রেস লীগ দু পক্ষের মধ্যে টানা-পোড়েন ক'রে ঘুরেছে, আর নিরাশ হয়েছে। আমরাও বেশ খানিকটা দ'মে গেলাম। "কত কাল পরে, বল ভারত রে, দুখ-সাগর সাঁতারে পার হবে ?" প্রাণপণে নৌকো বেয়ে চলছে দেশ, কিন্তু তীরের সন্ধান সত্যই যে কবে মিলবে ?

মওলানা আজাদের প্রতিশ্রুতি

ভারাক্রান্ত মনে আমরা একসঙ্গে সবাই গেলাম সিসিল হোটেলে। লীগের প্রায় সব নেতা সেখানে রয়েছেন, আর খবর জোগাড় করার সব চেয়ে জোরালো জায়গা হল ঐ হোটেলের 'লবী'। সেখানে সর্ব্বদাই সাংবাদিকের ভিড়; আমরা গিয়ে ভিড় বাড়ালাম। কমরেড সজ্জাদ জহীরের সঙ্গে সেখানে দেখা ; মওলানা আজাদের সঙ্গে সজ্জাদের কয়েকবার দেখা হয়েছে, কিন্তু বৈঠক যে প্রায় ভেস্তে গিয়েছে, এই হল তাঁর ধারণা। ইফ্‌তিখার বলল যে, মওলানার কাছাকাছি কয়েকজন রীতিমত যা-তা



কথা ব'লে বৈঠক ভণ্ডুল করার চেষ্টা করছে। আর একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড হল এই যে, অ-কংগ্রেসী হুমায়ুন কবীর হঠাৎ মওলানার সেক্রেটারী ব'নে গিয়েও এমন ঘনঘন বড়লাট প্রাসাদে যাতায়াত করছেন যে সাংবাদিকদের মধ্যে তা নিয়ে যথেষ্ট কানাঘুষা চলছে। কবীর নাকি কোন এক পুরানো অক্সফোর্ড-ওয়ালা দোস্তের সঙ্গে বাৎচিৎ করতে যান, কিন্তু ইফ্তি, সজ্জাদ আর আমি অক্সফোর্ডে কবীরের সমসাময়িকদের সম্বন্ধে বেশ কিছু খবর রেখেও এই নবাবিষ্কৃত "বন্ধুটীর" কথা কখনও শুনি নি।

পরদিন (১৩ই জুলাই) সকালে মওলানা আজাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল। সৌম্য, শান্ত, সমাহিত-মূর্ত্তি রাষ্ট্রপতিকে দেখলেই মনে শ্রদ্ধা জেগে ওঠে। আমাদের তরফ থেকে জে-সি-গুপ্ত অল্প কথায় রাজবন্দীদের কথা জানালেন, বিচারের যে প্রহসন ঘটেছে, বন্দীদের যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে, মওলানা আজাদ আর মিষ্টার জিন্নার কাছে আলিপুর জেল থেকে তাঁদেব পাঠানো তার যে সরকার আটকে দিয়েছে—সব কথা মওলানা মন দিয়ে শুনলেন। জবাবে তিনি বললেন যে, এই রাজবন্দীদের কথা সর্ব্বদাই তাঁব ও তাঁব প্রত্যেকটী সহকর্ম্মীব মনে রয়েছে। "এদের কথা কি কেউ ভুলতে পারে?" বলতে গিয়ে রাষ্ট্রপতির গলা যেন ভারী হয়ে এল। "এদের মধ্যে অনেকে বালকবয়সে জেলে গিয়েছেন আর আজ তাঁরা অকালবৃদ্ধ। বৈঠকের ফলে একটা সুরাহা হোক বা না হোক, এই বন্দীদের কথা কংগ্রেসের সব দাবীর আগে থাকবে—কংগ্রেস শুধু ১৯৪২ সালের বন্দীদের মুক্তি নয়, এঁদের মুক্তির জন্যও লড়বে।"

মওলানা আজাদ বড়লাটকে বলেছিলেন যে, কংগ্রেস "গড়তে চায়, বিগড়াতে চায় না'; তাই বহু বন্দী জেলে থাকা সত্ত্বেও সিমলা বৈঠক চলছে। কিন্তু বন্দীদের ফিরিয়ে আনা ব্যাপারে কংগ্রেস কখনই অবহেলা করতে পারে না, করবে না।

লীগ-নেতার সহানুভূতি

"আর্ম্মস্‌ডেল্" থেকে বেরিয়ে প্রফুল্লমনে আমরা চললাম সিসিল হোটেলের দিকে। মিষ্টার জিন্নার সঙ্গে মোলাকাৎ করার জন্য চেষ্টাচরিত্র করতে হবে, লীগের

কয়েকজন হোমরাচোমরা এ-বিষয়ে হয়তো সাহায্য করবেন। লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য মিঞা বশীর আহ্‌মদের সঙ্গে দেখা হ'ল; "পীপল্‌স্‌ ওয়ারের" তিনি নিয়মিত পাঠক ও অনুরাগী। "আপনারা কমিউনিষ্টরাই আসল কাজ করছেন," তিনি আমাদের বললেন। আমরা বললাম, "আপনারা সবাই না এলে আমাদের কাজ যথেষ্ঠ হতে পারে না।" তিনি সায় দিলেন, কিন্তু বল্‌লেন যে আপাততঃ ভবিষ্যৎ অন্ধকার, তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। আমরা যে রাজবন্দীদের কথা জানাতে গিয়েছিলাম, তাদের সম্বন্ধে তিনি "পীপল্‌স্‌ ওয়ার" মারফৎ খবর রাখেন, তাঁর সহানুভূতির কথাও তিনি বলেন।

সংবাদিক মহলে আগ্রহ

সিসিল হোটেলের 'লবীতে' বহু সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সবাই আমাদের কাজে খুবই আগ্রহ দেখালেন। লীগের মধ্যে বোঝাপড়ার জন্য যে বেশ চেষ্টা হয়েছিল, তা আমরা বেশ বুঝলাম। কিন্তু লীগের 'কাউন্সিল অব অ্যাক্‌শন্‌' আর 'পার্লামেন্টারী বোর্ডের' সভা চলছিল ব'লে মিষ্টার জিন্নার সঙ্গে দেখা হল না। কায়দে আজম স্বয়ং কিছু না বললে রাজবন্দীদের সম্পর্কে আর কোনও লীগনেতা যে বিবৃতি দিতে রাজী হবেন না, তাও বোঝা গেল।

নিরঞ্জন সেনের আন্দামানী অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সাংবাদিকরা খুব ঔৎসুক্য দেখালেন। কয়েদখানার নানা যন্ত্রণা, পায়ে বেড়ি পরার দুর্ভোগ, অনশন ধর্ম্মঘটের সময় বুক চেপে ধ'রে নাকের মধ্যে 'টিউব' ঢুকিয়ে জোর ক'রে খাওয়ানোর বর্ব্বরতা ইত্যাদি শোনার জন্য ভিড় লেগে গেল। আলিপুর জেল থেকে আজাদ ও জিন্নার কাছে পাঠানো যে তার সরকার আটকেছিল, সেটা প্রচার করা হবে ব'লে আমরা শুনলাম কিন্তু সে-সম্বন্ধে আর কোনও উচ্চবাচ্য পরে শুনি নি। কারণটা ঠিক বুঝলাম না; আবার সরকার সেটা আটকেছে কি না জানি না।

দুপুরে বেজায় বৃষ্টি। ঠিক সন্ধ্যা সাতটার পূর্ব্বে গান্ধীজীর কাছে আমাদের যাওয়ার কথা। গান্ধীজীর ডেরা পাহাড়ের অনেকটা উঁচুতে; খানিক বাদে গুপ্ত সায়েব একটা 'রিক্‌শা' পেলেন, আমরা হেঁটেই চললাম। 'ম্যানর ভিলে'র

কাছে যখন আমরা পৌছেছি, তখন ওয়ার্কিং কমিটির সভা শেষ ক'রে সবাই ফিরছেন। রাস্তায় গুপ্ত সায়েবের সঙ্গে পণ্ডিত নেহেরু, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ভুলাভাই দেশাই, কৃপালনি প্রভৃতির কথা হল; সবাই আমাদের কাজ সম্পর্কে আগ্রহ দেখালেন, কেবল নিরঞ্জন বাবুকে প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় বললেন, বৈঠক যখন ভেঙে যাচ্ছে তখন আর রাজবন্দীদের সম্পর্কে কি করা যেতে পারে। অথচ গান্ধীজী, মওলানা আজাদ আর পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় আমরা বুঝি যে বৈঠক বিফল হওয়াতে আন্দোলন আরও বেশী প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।

গান্ধীজীর আশীর্ব্বাদ ও সমর্থন

আমাদের ওপর যে কেউ কেউ রীতিমত অপ্রসন্ন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল গান্ধীজীর বাড়ী গিয়ে। সাতটায় আমাদের গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার কথা। পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর সাতটা বেজে দশ মিনিটে আমাদের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হ'ল, আর আমরা বসতে না বসতে গান্ধীজীর সেক্রেটারী শ্রীপ্যারেলাল এসে বললেন, উপাসনার সময় হয়েছে। অথচ শ্রীপ্যারেলালই দেখেছিলেন যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগে থেকেই আমরা ব'সে আছি, কিন্তু তবুও সময়মত ডাকেন নি। আমরা আগে থেকে এসে ব'সে আছি জেনে গান্ধীজী শ্রীপ্যারেলালকে ব'লে দিলেন যে উপাসনার সময় হলেও তিনি পূর্ব্বের বন্দোবস্তমতো আমাদের সঙ্গে পনেরো মিনিট কথাবার্ত্তা বলবেন।

সদাহাস্যময়, চিরতরুণ এই বৃদ্ধকে দেখলেই তাঁর অপূর্ব্ব নেতৃত্বের কারণ বুঝতে দেরী হয় না। নিরঞ্জনবাবুকে দেখেই গান্ধীজী চিনলেন—"তোমাকে আমি আগে দেখেছি—একবারের বেশী দেখেছি।" স্নেহাংশুর পরিচয় পেয়ে তিনি বললেন—"ব্যাপারটা কি বল তো? আমার সঙ্গে একটা মারামারি করতে এসেছ বুঝি?" জে-সি-গুপ্ত সংক্ষেপে আমাদের ডেপুটেশনের উদ্দেশ্য জানালেন। ইফ্তিখার এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল, পাঞ্জাবের দীর্ঘ মেয়াদী বন্দীদের কথা বলল। গান্ধীজী আমাদের ঠাট্টা ক'রে বললেন, "তোমরা শুধু বাংলার দিক টেনে কথা বলছ, না?" আমরা জানালাম যে পাঞ্জাব থেকে খবরাখবর আমরা জোগাড় করছি, আর পণ্ডিত নেহরুর পরামর্শে আসামের বন্দী রাণী গিদাল্লোর কথাও আমাদের রিপোর্টে দিয়েছি।

গান্ধীজী মন দিয়ে সব কথা শুনে বললেন, বন্দীদের কথা সর্ব্বদাই তাঁর মনে আছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে তাঁর কাজের ধরণ হল আলাদা, সরকারের কোথাও গলদ দেখলেই তিনি চেপে ধরেন। বন্দীমুক্তি আন্দোলনে তাঁর আশীর্ব্বাদ ও সমর্থন আমরা পাব, এ কথা স্পষ্টই আমরা জেনে এলাম।

গান্ধীজীর কাছ থেকে বেরোতেই নানা সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা। তারপর জে-সি-গুপ্ত গেলেন সিমলা কালীবাড়ীতে বাঙালীদের এক সভায়, আমরা ক'জন গেলাম সিসিল হোটেলে। সেখানে সজ্জাদের কাছে শুনি যে আমাদের আসায় খানিকটা সোরগোল হয়েছে। মওলানা আজাদের আসল সেক্রেটারী আজমল খানকেও (হুমায়ুন কবীর হলেন হঠাৎ বনে-যাওয়া সেক্রেটারী) নাকি কে বলেছে যে, কলকাতা থেকে কি এক অনির্দ্দিষ্ট মতলব নিয়ে কমিউনিষ্টরা হাজির হয়েছে। জে-সি-গুপ্তের মত নিছক কংগ্রেস-নেতা যে তাদের নায়ক তা জেনে তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন। সিসিল হোটেলে কিছুক্ষণ আমরা রইলাম—দেখলাম আসা যাওয়া করছেন লীগের নেতারা, আর থেকে থেকে দেখা দিচ্ছে কংগ্রেস লীগের মধ্যে ঐক্যের বিরোধী কয়েকটী দুষ্ট-গ্রহ। দেশের আনাচ-কানাচ থেকে যেন তারা সিমলার ওপর ঝেঁকে পড়েছে।

জহরলাল নেহেরুর আশ্বাস

পরদিন (১৪ই জুলাই) বড়লাট মঞ্জিলে বৈঠক। নেতাদের দেখার জন্য সিমলা ভেঙে পড়েছে। পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হল। গুপ্ত সায়েবের সঙ্গে তাঁর আরও কয়েকবার দেখা হয়েছিল। আমাদের কাজে তাঁর আগ্রহ খুব বেশী। তাঁরই পরামর্শে আমাদের রিপোর্টে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী কাপুর, শিববর্ম্মা ও গয়াপ্রসাদের (এঁরা সবাই এখন কমিউনিষ্ট) নাম আর রাণী গিদাল্লোর নাম দেওয়া হয়েছিল। তিনি আশ্বাস দিলেন যে বন্দীমুক্তি সম্বন্ধে একটা বিবৃতি তিনি শীঘ্রই দেবেন।

বৈঠক যে ভেঙে যাবে, তা একরকম জানাই ছিল। কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণই আশা। আগের দিন গান্ধীজী হেসে আমাদের বলেছিলেন যে হাল ছাড়ার দরকার নেই, এখনও একটা রাত বাকী রয়েছে, মিটমাট হলেও বা হতে পারে। যাই হোক, আশা ভঙ্গ হল, বড়লাটের কাছে এমনভাবে হার মানা আমাদের পক্ষে যে একটা কত বড় শরমের কথা, নেতারা যেন তা বুঝলেন না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সেদিনই

আমরা সিমলা ছাড়লাম। শুধু মনে এই আশ্বাস নিয়ে এলাম যে আমরা যে বিশেষ কাজ নিয়ে গিয়েছিলাম, সে-কাজ সাফল্যের দিকে অনেকটা এগিয়েছে। বাংলার "বিস্মৃত বন্দীরা" এখন আর বিস্মৃত নন, তাঁদের মুক্তির দাবী আজ সাড়া দেশ তুলে নিয়েছে। ("জনযুদ্ধ" হইতে উদ্ধৃত)।

বিলাতের শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নিকট দেশনেতাদের আবেদন

বিলাতের নির্ব্বাচন শেষ হওয়ার পর জুলাইমাসে নূতন শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩রা আগষ্ট, লণ্ডনে প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ্যাট্‌লীর নিকট প্রেরিত এক তারে অবিলম্বে ভারতীয় রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করা হয়। উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন—ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ডাঃ মেঘনাদ সাহা, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ মৃণালকান্তি বসু ও জেনারেল সেক্রেটারী এন-এম-জোশী, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ আর এ খেদ্‌-গিকার, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মিঃ ফজল এলাহি কোরাবান ও মিঃ এস এস মিরাজ্‌কর, রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলন কমিটির প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে-সি-গুপ্ত, অমৃতবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ডাঃ ধীরেন্দ্র নাথ সেন, যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক মিঃ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নিখিল ভারত কিসান সভার সভাপতি মুজফ্‌ফর আহমদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক কে পি চট্টোপাধ্যায় ও নিখিল ভারত কিসান সভার সাধারণ সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জ্জী। যে তারটী পাঠান হয় তাহা এই :

"বৃটিশ জনগণের বিজয়ে অভিনন্দন জানাইতেছি। অবিলম্বে অচল অবস্থার অবসান ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিই ভারতের দাবী। বিভিন্ন প্রদেশ বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে অবিলম্বে বিবেচনা করুন। ইঁহাদের অধিকাংশই সন্ত্রাসবাদমূলক কার্য্যাবলীর অপরাধে জরুরী ট্রাইবুন্যাল কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ১০ হইতে ২০ বৎসর কারাদণ্ডভোগ করিয়াছেন। কিন্তু ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী মতবাদ গ্রহণের কথা ও সন্ত্রাসবাদে আস্থাহীনতার কথা বিবৃতি প্রসঙ্গে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও ইঁহারা এখন পর্য্যন্ত অমানুষিক যন্ত্রণার মধ্যে আটক আছেন।"

বাংলার সর্ব্বত্র জনসমাবেশ

সর্ব্বদলীয় বন্দী-মুক্তি আন্দোলন-কমিটির উদ্যোগ

বাংলার বীর বন্দীদের মুক্তির জন্ম সমস্ত দেশবরেণ্য নেতাদের পক্ষ হইতে আন্দোলন চালাইবার আহ্বান সারা বাংলায় ছড়াইয়া পড়িল। ইহার ফলে সারা প্রদেশব্যাপী বাঙ্গালী জনসাধারণ সমাবেশের ভিতর দিয়া বন্দী-মুক্তির দাবী মুখরিত করিয়া তুলে। প্রত্যেক জেলাতেই বহু জনসভা হইতে এই দাবী উত্থিত হইতে থাকে। নীচে কয়েকটী সভার কথা উল্লেখ করা হইল:

হুগলী জেলার চুঁচুড়া ময়দানে ২৯শে আগষ্ট এক বিরাট জনসভা হয়। এই সভায় "সর্ব্বদলীয় বন্দী-মুক্তি কমিটি"র পক্ষ হইতে শ্রীযুত জে, সি, গুপ্ত ও নিরঞ্জন সেন উপস্থিত থাকেন। শাসন-সংস্কার-পূর্ব্ব বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া কয়েকজন বক্তা বক্তৃতা দেন। সমবেত জনতার ভিতর হইতে বন্দী-মুক্তির প্রশ্ন সমাধানের জন্ম দৃঢ়প্রতিজ্ঞার মনোভাব ব্যক্ত হয়। সভায় অপরাপর রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তিও দাবী করা হয়।

ঐদিন হাওড়া সভ্য হলে বন্দীমুক্তি দাবীতে সভা হয়। সমস্ত প্রকার রাজবন্দীর মুক্তি-দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বরিশাল শহরে ২৩শে আগষ্ট বন্দী-মুক্তির দাবীর উপর একটি জনসভা হয়। "বরিশাল হিতৈষী" সম্পাদক শ্রীযুত দুর্গামোহন সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কংগ্রেসনেতা শ্রীযুত সরল দত্ত প্রথমেই বক্তৃতা দেন এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বন্দী-মুক্তি দাবীর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুত অবনী ঘোষ যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের ও অন্তান্ত সমস্ত বন্দীর মুক্তি-দাবী করিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন, প্রবীণ উকীল মনোরঞ্জন মুখার্জি ও অমিয় দাশগুপ্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। এত বড় সভা বরিশালে ইদানীং হয় নাই। শ্রোতাদের ভিতর প্রায় ৩০০ জন ছাত্র ছিলেন।

ঐদিনই স্থানীয় ব্রজমোহন কলেজে ছাত্র-ফেডারেশনের উদ্যোগে বন্দী-মুক্তি দাবী করিয়া একটি ছাত্র-সভা হয়।

শ্রীযুত সরলকুমার দত্ত, পিয়ারীলাল রায়, অবনীনাথ ঘোষ, মুকুলরঞ্জন সেন, দুর্গামোহন সেন এবং বরোদাকান্ত ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি বরিশালের জননেতাগণ সংবাদ-পত্রে একটি বিবৃতি দেন। শাসন-সংস্কার-পূর্ব্ব যুগের বন্দীদের মুক্তি-দাবী করিয়া বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন :

"....গান্ধীজীর দায়িত্ব (বন্দী-মুক্তি সম্পর্কে গান্ধীজীর প্রতিজ্ঞা—সঃ) বাংলার প্রত্যেকটি সন্তানেরই দায়িত্ব। আমরা এই সব বন্দীদের (দীর্ঘমেয়াদী বন্দী) মুক্তি চাই। সমগ্র জনসাধারণকে আমরা ইঁহাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করিতে আহ্বান জানাইতেছি। এই আন্দোলনের জোরেই কারাগারের দুয়ার উন্মুক্ত হইবে। বাংলা তাহার বন্দী সন্তানদের মুক্ত নাগরিক হিসাবে ফিরিয়া পাইবে। যাঁহাদের আমরা কোন দিন ভুলিতে পারি না সেই সব সন্তানদের বাংলা দেশ যেন বিস্মৃত না হয়।"

চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগর-মজিলপুরে ২৬শে আগষ্ট একটী বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। বীর-বন্দী সুনীল চ্যাটার্জ্জী জয়নগর-মজিলপুরেরই যুবক। এখানকার হাজার দেশসেবার কাজে সুনীলের স্মৃতি বিজড়িত। বন্দীমুক্তির দাবীতে সেদিন মজিলপুর ধন্বন্তরী চাঁদনীতে লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। দেড় হাজার শ্রোতার এত বড় সভা ইতিপূর্ব্বে এখানে খুব কমই দেখা গিয়াছে। জেলার কংগ্রেসনেতা শ্রীযুত প্রফুল্লনাথ ব্যানার্জ্জী সভায় সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেসনেতা জে সি গুপ্ত, লীগনেতা লাল মিঞা, কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা নবাবজাদা হাসানআলি প্রভৃতি সভায় আসিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া ও বন্দী-মুক্তি আন্দোলনকে আরো জোরালো করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়া যে সব পত্র পাঠাইয়াছিলেন, স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত অমরকুমার ঘোষ সেগুলি সভায় পাঠ করেন। "বন্দী-মুক্তি কমিটি"র অন্যান্য নেতারা সভায় বন্দীদের মুক্তি-দাবী করিয়া বক্তৃতা করেন। পরে স্থানীয়ভাবে আন্দোলন চালাইবার জন্য "জয়নগর-মজিলপুর বন্দী-মুক্তি আন্দোলন কমিটি" গঠিত হয়।

বাঁকুড়ায় ২৫শে হইতে ৩১শে আগষ্ট শাসন-সংস্কার-পূর্ব্ব বন্দীদের মুক্তির জন্য একটী "সপ্তাহ" উদ্‌যাপন করা হয়। ছয়টী স্থানে সভা করিয়া সপ্তম দিনে শহরে বিরাট জনসমাবেশ হয়। একটী শোভাযাত্রা "বন্দীমুক্তি চাই" ধ্বনি

করিতে করিতে শহরের রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। প্রতিদিন ভোরে প্রভাতফেরী বাহির করিয়া শহরের অধিবাসীগণকে এই আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন করা হয়। বিষ্ণুপুর অঞ্চলেও ঐ বন্দীমুক্তি সপ্তাহ প্রতিপালিত হয়।

ছাত্র অভিযান—২৯শে আগষ্ট ছাত্রফেডারেশন কর্তৃক "বন্দী-মুক্তি দিবস" ঘোষণা করা হয়। ঐ দিন কলিকাতায় ছাত্রছাত্রীদের বিরাট অভিযান ১৯৩৮ সালের বন্দীমুক্তি আন্দোলনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বেলা ১টায় সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অগণিত ছাত্রছাত্রীর ভিড় জমিয়া উঠে। পনের হাজার ছাত্রছাত্রীর সভায় রাজবন্দীদের মুক্তির জন্ত প্রচণ্ড সংকল্প ঘোষিত হয়। সভার পর আট হাজার ছাত্রছাত্রীর বিরাট মিছিল সমস্ত কলিকাতার লোক বিস্ময়ে দেখিতে লাগিল। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে বিড়লা-পরিচালিত একটি ব্যাঙ্কে রাজ-পতাকা উড্ডীন ছিল। সহস্র কণ্ঠের দাবীতে সে পতাকা নামিয়া গেল। ছাত্রদের সে কী উৎসাহ, যেন গোলামীর শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তুমুল উদ্দীপনার ভিতর সেদিনের মিছিল শেষ হয়।

আন্দোলনে নব উদ্দীপনা

এইভাবে বন্দী-মুক্তির দাবীতে বাংলার জেলায় জেলায় যখন জনসাধারণের বিরাট অভিযান চলিয়াছে, তখন কয়েকজন বন্দী মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের বিভিন্ন তারিখে ২৬ জন বিপ্লবী বন্দীর মুক্তি হইয়াছে। এই মাসে যাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের ভিতর আছেন :

(১) বরিশাল দারোগা হত্যা-মামলার রমেশ চ্যাটার্জি। ইনি যাবজ্জীবন দণ্ডভোগের পর মুক্ত হইলেন।

(২) আন্তপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার সুরেন ধর চৌধুরী, বিমল ভট্টাচার্য্য, প্রভাত মিত্র, দ্বিজেন তলাপাত্র, নিরঞ্জন ঘোষাল, জিতেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সত্যেন মজুমদার, অমূল্য সেন, পরেশ গুহ, জ্যোতিষ মজুমদার ও হরিপদ দে। ইঁহাদের প্রত্যেকেই মোট তের বৎসর কারাজীবন যাপন করিয়াছেন।

(৩) হিলি মেল ডাকাতি মামলার প্রফুল্ল সান্তাল, সত্য বক্রবর্ত্তী ও সরোজ বসু। ইঁহাদের বার বৎসর করিয়া জেল খাটিতে হইয়াছে।

(৪) অস্ত্র আইনের বন্দী চট্টগ্রামের মণিলাল দত্ত, কালী কিঙ্কর দে ও হিমাংশু ভৌমিক। ইঁহারা ১২ বৎসর পর বাহিরে আসিলেন।

(৫) বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলার রজতভূষণ দত্ত ও প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়। ইঁহারা ১২ বৎসর পর দেশের জনগণের ভিতর ফিরিয়া আসিলেন।

(৬) টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, জীবন ধূপী ও শ্যামবিনোদ পাল। অস্ত্র-আইনের বলে দণ্ডিত বন্দী পূর্ণেন্দু গুহ ও রাধাবল্লভ গোপ। রংপুর ষড়যন্ত্র মামলার কুমুদ মুখার্জ্জি। ইঁহারা দীর্ঘদিন পর বাহিরে আসিলেন।

এই বন্দীরা জনগণের ভিতর ফিরিয়া আসার পর হইতে বন্দীমুক্তি আন্দোলনে এক নূতন জোয়ার শুরু হয়। তাঁহাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা পরিপূর্ণ সুস্থ না হওয়া সত্ত্বেও, একদিনও বিশ্রাম না করিয়া তাঁহারা আন্দোলনে শরীক হইয়া পড়েন। যেসব বন্দীদের ইঁহারা জেলের ভিতরে রাখিয়া আসিলেন তাঁহাদের মুক্তির কথাই ইঁহাদের সমস্ত কাজের প্রথমে মনে পড়ে। তাই তাঁহারা আসিয়াই যে বিবৃতি দেন তাহাতে এই আহ্বানই মূর্ত্ত হইয়া উঠে।

সংস্কারপূর্ব্ব বন্দী চট্টগ্রামের **মণিলাল দত্ত**, বরিশালের **রমেশ চট্টোপাধ্যায়**, ফরিদপুরের **প্রফুল্ল সান্যাল**, কলিকাতার **প্রভাত মিত্র**, দিনাজপুরের **সত্যব্রত চক্রবর্ত্তী** এবং বীরভূমের **রজত দত্ত** বাংলার বিভিন্ন জেল হইতে দীর্ঘ দণ্ডভোগের পর মুক্তিলাভ করিয়া দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁহারা যে যুক্ত-বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা নীচে দেওয়া হইল :

"এক যুগেরও অধিক কাল পরে আমরা কারামুক্ত হইলাম। দেশবাসী আমাদের প্রতি এতকাল যে-স্নেহ পোষণ করিয়াছেন এবং কারার দ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য যে-সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কারান্তরালে বৎসরের পর বৎসর যে-যন্ত্রণা আমাদের ভোগ করিতে হইয়াছে, দেশবাসীর প্রীতিই সে-দুঃখকে সহনীয় করিয়াছিল।

"যাঁহাদের পিছনে রাখিয়া আসিলাম, কারামুক্তির পরে সেই সকল উদারপ্রাণ সহকর্ম্মীদের কথাই সর্ব্বক্ষণ মনে পড়িতেছে। তাঁহারা শুধু যে দৈহিক যন্ত্রণাই ভোগ

করিতেছেন তাহা নহে, 'বাহিরে আসিয়া দেশের কত কাজ করিবার আছে, কত কাজ করিতে পারি' এই চিন্তা তাঁহাদের বিপ্লবী মনকে সর্ব্বক্ষণ অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।

"সুতরাং আমাদের মুক্ত করিয়া আনিবার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার সঙ্গে সঙ্গে এখনো যাঁহারা কারাগারে পড়িয়া রহিলেন, তাঁহাদের মুক্তির জন্য আরো প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার আবেদনও দেশবাসীর নিকট আমরা উপস্থিত করিতেছি। সেই প্রবল আন্দোলনের বেগে গবর্ণমেণ্ট যেন আর একদিনও তাঁহাদের বন্দী করিয়া রাখিতে না পারে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে বিরাট জাতীয় আন্দোলন' ১৯৩৭ সালে আমাদের নির্জ্জন আন্দামান হইতে বাংলার বুকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, তাহার কথা অমরা কৃতজ্ঞতা ও গর্ব্বের সহিত স্মরণ করি। কারারুদ্ধ বন্দীদের মুক্তির জন্য কি আবার তেমন প্রবল আন্দোলন জাগিয়া উঠিবে না? দেশবাসীকে আমরা এই বীর বন্দীদের অতীত স্বার্থত্যাগের কথাই শুধু স্মরণ করাইব না; সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হইয়া আসিলে দেশের আজিকার এই দুর্য্যোগের দিনে জাতির স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির সংগ্রামে তাঁহারা যে অপরিসীম স্বার্থত্যাগ করিবেন, সে-কথাও দেশবাসীকে বলিব।"

মুক্তির পর ইঁহাদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য কলিকাতা ও আশপাশের অঞ্চলে বহু জনসভা আহুত হয়। প্রত্যেকটি সভায় যে-সব দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দী এখনো কারাগারে পচিতেছেন তাঁহাদের মুক্তির প্রশ্নই বড় হইয়া দেখা দেয়। হাওড়া ও ২৪পরগণার বিভিন্ন সভায় বন্দীদের মুক্তির দাবী বিপুল জনতার ভিতর হইতে মুহুর্মুহু উত্থিত হইতে থাকে। কলিকাতার বিভিন্ন পাড়ার কংগ্রেসকর্মীদের বৈঠকে ইঁহারা বন্দীমুক্তির সমস্যাকেই সর্বাগ্রে তুলিয়া ধরেন। সমস্ত দেশভক্তই এই আহ্বানে অগ্রসর হইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে ১৯শে সেপ্টেম্বর এক বিরাট জনসভায় কম্যিউনিষ্ট পার্টীর পক্ষ হইতে এই সমস্ত মুক্ত বন্দীদের অভ্যর্থনা জানান হয়। মুক্ত-বন্দীরা বন্দী-মুক্তি-আন্দোলনের জন্য জনসাধারণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও শ্রমিক কৃষক জনসাধারণের সেবায় অবিলম্বে আত্মনিয়োগ করিবার কথা ঘোষণা করেন।

এই সমস্ত মুক্ত বন্দীদের কারাগারের বাহিরে জনগণের দৈনন্দিন আন্দোলনের ভিতরে পাইয়া এবং তাঁহাদের নিরলস কর্মোদ্যমের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া জনসাধারণের মনে এক বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়। ফলে বন্দীমুক্তির জন্য আরব্ধ গণ-আন্দোলনে নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি হইতে থাকে।

গণ-আন্দোলনই বন্দী-মুক্তির মোক্ষম অস্ত্র

দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দীদের মুক্তির জন্য জনসাধারণের আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। কিছুকিছু বন্দী সম্প্রতি মুক্তিলাভও করিয়াছেন। কিন্তু যাবজ্জীবন মেয়াদে দণ্ডিত ৪৬ জন বন্দী এখনও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রহিয়াছেন।

গত দশবৎসর ধরিয়া এই সব বন্দীদের মুক্তির জন্য ভারতের জনসাধারণের পক্ষ হইতে দাবী উঠিয়াছে। সুদূর আন্দামানে নির্ব্বাসিত বন্দীদের জীবনে কি ঘটিতেছে কেহই জানিত না। বার বৎসর পূর্ব্বে তিনজন বীর বন্দীর জীবন বিসর্জ্জনের ভিতর দিয়াই এই বন্দীদের প্রতি বাহিরের দেশবাসীর প্রথম দৃষ্টি পড়ে। তাঁহাদের জীবনাবসান যে ইঙ্গিতের সৃষ্টি করিয়াছিল আজ তাহাই ব্যাপক আন্দোলনে রূপায়িত হইয়াছে। বারবার ব্যাপক গণ-আন্দোলনও চলিয়াছে।

দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, সাম্রাজ্যবাদী সরকার কারাগারের নির্ম্মম নির্য্যাতনে এই সমস্ত অগ্নিপূজারী বীর দেশভক্তদের জনসেবার আকাঙ্খা নষ্ট করিয়া দিতে চায়, দেশের বীর সৈনিকদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতে চায়, তাই সে উদ্ধত মনোভাবে প্রতিবারই বন্দীমুক্তির দাবীকে উপেক্ষা করিয়াছে। আন্দোলনের নেতাদের কাছে সরকার ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিয়া কখনও বা এই প্রশ্নকে ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছে, আবার কখনও বা নানা অজুহাতের আশ্রয় লইয়া মুক্তির প্রশ্নকে একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছে।

আমরা এই অভিজ্ঞতাও পাইয়াছি যে, যখনই দেশবাসী শাসন-সংস্কার প্রভৃতির সময় সরকারের 'শুভেচ্ছা'র উপর নির্ভর করিয়াছে, এবং ব্যাপক গণ-আন্দোলনের কথা সাময়িকভাবে বিস্মৃত হইয়াছে ; তখনই এইসব দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

গত দশবৎসরে আমাদের দেশবাসীর এই শিক্ষা হইয়াছে যে, শুধু সরকারের প্রতিশ্রুতির উপর বা কোন নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর ভরসা করিয়া থাকিলে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি হউক বা না হউক, একথা ধ্রুব সত্য যে এই সমস্ত দীর্ঘ-মেয়াদী 'সন্ত্রাসবাদী' বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি আসিতে পারে না। সেই কারণেই ইঁহাদের মুক্তির জন্য বিশেষভাবে জোর দিয়া পৃথক সমস্যা হিসাবে আন্দোলন করা প্রয়োজন হয়। মনে রাখিতে হইবে সরকারের প্রতিশ্রুতি বা নূতন অবস্থার উপর ভরসা—এসবের কিছুরই দ্বারা ইঁহাদের মুক্তি আসিবে না। ইঁহাদের মুক্তি একমাত্র জন-আন্দোলনের প্রচণ্ড শক্তির উপরই নির্ভর করে। সর্ব্বভারতীয় জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ ও ব্যাপক আন্দোলনই ইঁহাদের মুক্তির একমাত্র মোক্ষম অস্ত্র। এবং ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই হাতিয়ার সম্বল করিয়া আজ বাংলার জনসাধারণ আগাইয়া চলিয়াছে।

শুধুমাত্র সরকারের শুভেচ্ছা ও সদিচ্ছা এবং দেশের ভিতর নূতন পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিকি অবস্থার উপর যদি এই সব বন্দীদের মুক্তি আসিতে পারিত তাহা হইলে আজ বহুদিন পূর্ব্বেই তাঁহারা আমাদের ভিতর ফিরিয়া আসিতেন।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ইঁহাদের কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার পক্ষে যতকিছু যুক্তি তর্কের ও অজুহাতের অবতারণা করিয়াছে, তাহা সমস্তই মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের আটক রাখিবার জন্য সরকারের হাতে যতগুলি যুক্তির তূণ ছিল তাহার প্রত্যেকটী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

দেশবাসী বহুদিন আগেই বুঝিয়াছে যে, এইসব বীর বন্দী খুনী ডাকাত নহেন। সরকার ইঁহাদের নামে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করিতে কসুর করে নাই কিন্তু দেশবাসী বুঝিয়াছে যে, তাঁহারা কোনদিনই বিশ্বাস করেন নাই দুইচারিজন ইংরেজ খুন করিয়া স্বাধীনতা আসিবে। তাঁহারা দেশবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিবার জন্য বীরের মত ফাঁসি কাঠের দিকে আগাইয়াছিলেন। তাঁহাদের সে

আত্মাহুতি ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহারা একবাক্যে দেশের কাছে নেতাদের কাছে জানাইয়া দিয়াছেন সন্ত্রাসবাদে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। জাতীয় আন্দোলনের যে পর্য্যায়ে ইঁহারা বোমাপিস্তলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার উদগ্র আকাঙ্খাকে রূপায়িত করিয়াছিলেন, ইতিহাসের সে অধ্যায় আজ সুদূর অতীতের বস্তু।

সরকার ভাবিয়াছিল কারাগারের লাঞ্ছনা ও দীর্ঘদিনের শৃঙ্খলিত অবস্থা এই সব বীরযোদ্ধাদের দেহ ও মন পঙ্গু করিয়া ফেলিবে। কিন্তু সে মতলবও আজ ব্যর্থ হইয়াছে। কারাগারের ভিতর হইতে এবং দীর্ঘ ১৭-১৮ বৎসর কারাদণ্ডভোগের পরও ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া বন্দীরা মুক্তির পর দেশবাসীকে যে বাণী শুনাইতেছেন তাহাই প্রমাণ করিয়া দেয় যে ইঁহারা সন্ত্রাসবাদী নন, ইঁহারা ভারতের মুক্তি আন্দোলনের বীর যোদ্ধা। "সন্ত্রাসবাদ" তাঁহাদের জীবনের বড় কথা নয়, অতুলনীয় দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রবল সাধনাই তাঁহাদের জীবন।

তাই দীর্ঘদিন পরে বন্দীরা মুক্ত হইয়া আসিলে কলিকাতায় যে অভ্যর্থনার আয়োজন হয়, তাহাতে বন্দীদের পক্ষ হইতে সত্যেন মজুমদার ঘোষণা করেন—"আমাদের কারাজীবনে আমরা দেশসেবার কথা একদণ্ডও ভুলি নাই। কারামুক্তির পর যাহাতে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তাহার জন্য আমরা নিজেদের প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছি। বাহিরের জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিলেও আমরা অবিরত সংগ্রাম করিয়াছি। বিচার-বিতর্ক আলোচনার মধ্য দিয়া আমরা বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপযোগী পন্থায় নিজেদের আত্মবিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।..."

তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে যেভাবে দলমত নির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধ বনিতা দেশবাসী তাঁহাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছেন, তাহাই প্রমাণ করিয়া দেয় যে, দেশবাসীর মন হইতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হন নাই, বরং তাঁহারা সমগ্র জনসাধারণের মনে আরো দৃঢ়ভাবে দেশভক্ত বীর হিসাবেই বরেণ্য ও পূজ্য হইয়া দেখা দিতেছেন।

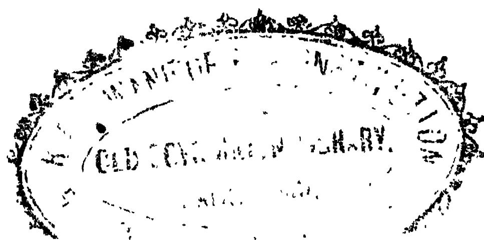
সেইজন্যই আজ বাংলা ও ভারতের প্রান্তে প্রান্তে তাঁহাদের বিনাশর্ত্তে মুক্তির জন্য আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছে। জাতীয় কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ নেতা ও কবিসম্রাট

হইতে সুরু করিয়া দেশের প্রতিটি মানুষ এই মুক্তি সাধকদের কারাগারের বাহিরে আনিবার আন্দোলনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিয়াছেন।

বন্দী-মুক্তি আন্দোলনের এই প্রবল তরঙ্গ দেশ বিদেশের মানুষকে আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। এ আলোড়নের আঘাতে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ধূলিসাৎ হইয়া যাইতে বাধ্য। দেশের মানুষ সমস্বরে অগ্নিযুগের বীর সৈনিকদের মুক্তি দাবী করিলে শাসকবর্গের দম্ভ চূর্ণ হইয়া পড়িবেই। এ আন্দোলন শাসকের নির্ম্মম ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অকুণ্ঠ দেশপ্রেমের লড়াই। যে বীরদের দেশাত্মবোধ অতুলনীয়, যে যোদ্ধাদের কর্ম্মোৎসাহ অদম্য, যে দেশকর্ম্মীদের স্বাধীনতার আকাঙ্খা বিশ্বইতিহাসে বিরল, যাঁহারা বাহিরে আসিলে দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত বাংলাকে পুনরায় গড়িয়া তুলিবার কাজে অগ্রণী হইবেন, যাঁহারা মুক্ত হইলে নতুন বাংলার স্রষ্টা হইবেন, তাঁহাদের মুক্তির আন্দোলন হইতে দূরে থাকিবে কে? ইঁহাদের মুক্তি-আন্দোলনের মহত্তর আদর্শে সারা দেশ অনুপ্রাণিত। এই উজ্জ্বল অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হইয়া বাংলার শহর ও গ্রাম ধ্বনিয়া উঠুক—অবিলম্বে বিপ্লবী বাংলার অগ্রদূত এই মুক্তিব্রতীদের কারালাঞ্ছনার অবসান চাই।

ভ্রম-সংশোধন

এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে ৮৩ পৃষ্ঠায় কয়েকটা তারিখ ভুল ছাপা হইয়াছে। আন্দামানে প্রথম বন্দী-প্রেরণের তারিখ ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর এবং তদানীন্তন বাংলার বন্দীদের ফিরাইয়া আনা হয় ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ভুলক্রমে ১৯০৯ এর স্থানে ১৯১৬ এবং ১৯২০ এর স্থানে ১৯২৬ ছাপা হইয়াছে।





[শিল্পী—সূর্য্য রায়]

(পরিশিষ্ট)

আন্দামান বন্দীদের অনশন ঘোষণা

ভারত সরকারের মনোভাব

"গত ৩০শে জুলাই ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে পোর্ট ব্লেয়ার সেলুলার জেলের অনেক জন সন্ত্রাসবাদী রাজবন্দী কতকগুলি দাবী পুরণের জন্য অনশন আরম্ভ করিয়াছেন।

"গত ৭ই আগষ্ট চীফ্ কমিশনার নিজে অনশনরত বন্দীদের জানাইয়াছেন যে, বাংলার প্রধানমন্ত্রী তাঁহাদের অনশন পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, তবুও ধর্ম্মঘট চলিতেছে। তাঁহাদের ভারতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে কোন আদেশ একমাত্র ভারত সরকারই দিতে পারেন—কারণ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ শাসনের ভার ভারত সরকারের।

"এই অনশনে জীবননাশের সম্ভাবনা ভারত সরকারকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এরূপস্থলে কোন সরকারই এই রকমভাবে দাবী মানিয়া লইতে পারে না, বিশেষ করিয়া যে সরকারকে এত বেশীসংখ্যক বন্দীদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে হয়।

"কারণ একথা যদি প্রকাশ পায় যে একদল রাজবন্দী ঐক্যবদ্ধভাবে অনশন করিয়া তাঁহাদের কারাবাসের স্থান এবং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন—তাহা হইলে সারা ভারতের জেল শাসন অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

"এই সকল কারণে ভারত সরকার এই কথা পরিস্কার করিয়া দিতে চাহে যে, যতদিন অনশন চলিবে ততদিন তাঁহারা বন্দীদের বা তাঁহাদের পক্ষের কোন লোকের দাবী বিবেচনা করিতে অসমর্থ।"

আগষ্ট, ১৯৩৭ —এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

সরকার নত হইবে না

আন্দামান বন্দীদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত মোহনলাল সাক্সেনার নিকট তদানীন্তন বড়লাটের পত্র :

বড়লাটের চিঠি

সিমলা, ১৩ই আগষ্ট

ভারতীয় জেল কমিটির রিপোর্টের প্রতি আপনার উল্লেখের কথা আমি প্রথম আলোচনা করিব। সেলুলার জেলে বন্দীদের আটকাইয়া রাখা ঐ কমিটির নিয়মবিরুদ্ধ নয়। আপনার হয়ত মনে থাকিবে যে, এই রিপোর্টের ৫৬৬তম অংশে কমিটি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে অল্পসংখ্যক বন্দীদের দ্বীপান্তরিত করিবার জায়গা হিসাবে অনুমোদন করিয়াছিল। সেই সঙ্গে প্রস্তাব করা হয় যে, জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার্থে সরকার যেসকল বাছাবাছা অল্পসংখ্যক বন্দীদের ব্রিটিশ ভারত হইতে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিবে তাঁহাদের আন্দামানে পাঠানো হইবে।

আপনার চিঠি পড়িয়া মনে হয় যে জেল-কমিটি যে ধরণের বন্দীদের পোর্টব্লেয়ারে রাখার নির্দেশ দিয়াছে—আপনি বর্তমানে আন্দামানে আবদ্ধ বন্দীদের সেই শ্রেণীভুক্ত করেন না। তাহা হইলে আমাকেও তৎক্ষণাৎ বলিতে হয় যে, তাঁহাদের অপরাধ ইচ্ছাকৃত ও অনেকস্থলে বেপরোয়া সন্ত্রাসবাদ নীতি পরিচালিত এবং অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় জেলগুলিতে তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য সরকারকে অনিচ্ছাসত্বেও বাধ্য হইয়া নিরাপদ জিম্মায় রাখিবার নিমিত্ত আলাদা ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

এই সব বন্দীরা প্রত্যেকেই রীতিমত বিচারের পর আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় একশো জন ডাকাতি, ডাকাতির সহিত মৃত্যু ঘটাইবার প্রচেষ্টা এবং ডাকাতি করিবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দণ্ডিত। বাকী বন্দীদের মধ্যে ৬০ জন খুন, খুন করার চেষ্টা এবং খুন করিবার ষড়যন্ত্রের অপরাধে অভিযুক্ত। অবশিষ্ট সকলেই অবৈধভাবে অস্ত্র এবং বোমা রাখিবার অথবা সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অপরাধে দণ্ডিত।

আপনি আপনার চিঠিতে সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে বন্দীদের মতামতের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছেন। আপনার এই ধারণার মূল কোথায় জানি না। আমি কেবল মাত্র এই কথা বলিতে পারি যে আমার নিকট যে খবর পৌঁছিয়াছে (যাহাতে কোনও অবিচার না হয় তাহার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন বলিয়া আমি অতি যত্নসহকারে খবরাখবর লইয়াছি), তাহা হইতে আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানিয়াছি যে বন্দীরা ঐপ্রকার পরিবর্ত্তনের কোনরূপ আভাষ দেখান নাই। বরং যে মনোভাবের জন্য তাঁহারা আজ দণ্ডিত—যে মনোভাব তাঁহাদের দ্বারা এই সকল অন্যায় কার্য্য করাইয়াছে, এখনও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁহাদের আচরণে সেই গর্ব্বিত ও উদ্ধত মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে।.........

বন্দীদের অনশন ত্যাগ করাইবার জন্য আপনি যে উপায়ের কথা প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আলোচনা করা যাক: প্রথমত আপনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সরকার বন্দীদের স্থানান্তরিত করিবার দাবীর নিকট আত্মসমর্পণ করুক। আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সরকারের পক্ষে ইহা করা কেন সম্ভব হইবে না ? , যদিও এই ব্যাপারে কেবলমাত্র যে ভারত সরকারই জড়িত আছে তাহা নহে, তবুও একথা আমি এখন তুলিব না।

কিন্তু জনসাধারণকে হিংসামূলক অপরাধের হাত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত। এই কথাটাই আমি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে চাই।

অনশন যাহাতে ভালোয় ভালোয় শেষ হয় তাহার জন্য লোকের যতই দুশ্চিন্তা হোক না কেন, সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে এক্ষেত্রে সরকারের আত্মসমর্পণ বন্দীদের বেশ উৎসাহিত করিবে। যে কোন দাবী এমন কি নিজেদের মুক্তি দাবীও যে এই একই রকম উপায়ে আদায় করা যায়, সে বিষয়ে বন্দীরা বেশ সচেতন হইয়া উঠিবে। এইভাবে অন্যান্য দলবদ্ধ বন্দীদের মনেও এ বিশ্বাস জাগিবে যে, প্রয়োজন হইলে তাহারাও এই উপায় অবলম্বন করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারে।

ইহার পশ্চাতে আপনার এবং আরও অনেকের অকপট ও নিঃস্বার্থ উদ্বেগ উপলব্ধি করিয়া এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই "শোচনীয় পরিণাম" নিবারণ করা উচিত মনে করি বলিয়াই আপনার চিঠির উত্তরে এই দীর্ঘ পত্র পাঠাইতেছি।

অন্যান্য বিষয়ে আমাদের মধ্যে যতই মতের অনৈক্য থাকুক না কেন এ বিষয়ে আমি ও আমার অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী একমত। যে সিদ্ধান্ত আমরা অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্বেও লইতে বাধ্য হইয়াছি—তাহা লইয়াছি এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, যে বন্দীরা যত শীঘ্র এই সিদ্ধান্তকে চরম ও অবধারিত বলিয়া উপলব্ধি করিবেন তত শীঘ্রই তাঁহারা তাঁহাদের বন্দীশালার নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত করিবার জন্য এই সাংঘাতিক পথ অবলম্বনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবেন।

সরকার নত হইলে—লাভ হইবে অলীক ও ক্ষণস্থায়ী। এই অনশন প্রথা যেকোন কারণেই অবলম্বিত হইবে। আরও অধিক বন্দীরা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে লোভিত হইবেন (এখনই অন্যান্য জেলের বন্দীরা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন) এবং যখন শেষ পর্য্যন্ত সরকার বাধ্য হইয়া কোন নিয়ম মানাইবার জন্য চেষ্টিত হইবে, তখন পরিণামে কেবল যে এখন যাঁহারা বিদ্রোহ করিতেছেন তাঁহাদের অবস্থাই শোচনীয় হইবে, তাহা নয়, অন্যান্য বহু লোকের পক্ষেও তাহা শোচনীয় ও দুঃখের হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির তীব্র নিন্দা

আন্দামান অনশনকারীদের প্রতি সরকারের নির্ম্মম ঔদাসীন্যের তীব্র প্রতিবাদ হিসাবে ১লা সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি (কংগ্রেস পার্টির ডেপুটি লীডার) কেন্দ্রীয় আইন সভার কার্য্য সেই দিনের জন্য স্থগিত রাখিবার যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহা ৬২ ভোটে গৃহীত হয়।

—স্টেটস্‌ম্যান্, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

অনশন ধর্ম্মঘটে গান্ধীজীর হস্তক্ষেপ

আন্দামান বন্দীদের বিভিন্ন তার ও বার্ত্তার সারমর্ম্ম

ওয়ার্দ্ধা হইতে ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ শ্রীযুত মহাদেব দেশাই নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন :

আন্দামান রাজবন্দীদের সম্বন্ধে তারযোগে পত্রালাপ গান্ধীজীর অনুমতি অনুসারে প্রকাশ করিতেছি। এই পত্রালাপ বাহির করিবার অনুমতি

দিয়া গান্ধীজী যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেনঃ তাহা এই 'আমার এবং আন্দামান রাজবন্দীদের মধ্যে যে বার্ত্তা বিনিময় হইয়াছে তাহা আমি আনন্দিত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি। সন্ত্রাসবাদের প্রতি তাঁহাদের বর্ত্তমান মনোভাব জানিবার জন্য আমার আবেদনের তাঁহারা যে মহান্ উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশা করিতে পারি যে তাঁহারা বিনাসর্ত্তে মুক্তি পাইবেন।'

বড়লাটের নিকট গান্ধীজীর তার

২৭শে আগষ্ট, ১৯৩৭

আন্দামান রাজবন্দীদের অনশন যদি এখনও চলিতে থাকে তাহা হইলে আপনি কি দয়া করিয়া নিম্নলিখিত বার্ত্তাটি তারযোগে অনশনকারী রাজবন্দীদের নিকট পাঠাইতে পারিবেন ?

'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সহিত একযোগে আমিও আপনাদের অনশন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আপনারা আমাদের উপর নির্ভর করুন—আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। সমগ্র জাতির অনুরোধ রক্ষা করিয়া আপনারা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হউন। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সন্ত্রাসবাদী ছিলেন—তাঁহারা আর সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করেন না এবং অহিংসাবাদকে শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করেন—এই নিশ্চয়তা যদি আমি আপনাদের নিকট হইতে পাই, তাহা হইলে নিজেকে খুব উপকৃত বলিয়া মনে করিব। একথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ হইতেছে, নেতারা অনেকেই বলেন যে, রাজবন্দীরা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস হারাইয়াছেন কিন্তু মাঝে মাঝে আবার উল্টা কথাও শোনা যায়।'

উত্তরে বড়লাটের তার

২৭শে আগষ্ট, ১৯৩৭

'এই বার্ত্তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। ইহা আমি অনশনকারীদের পাঠাইয়াছি এবং আপনার নিকট তারে উত্তর পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি।—বড়লাট।'

আন্দামান হইতে তার

পরে গান্ধীজী আন্দামান-নিকোবরের চীফ কমিশনারের নিকট হইতে নিম্নলিখিত তার পান :

পোর্টব্লেয়ার—২৮শে আগষ্ট, ১৯৩৭

'আপনার বার্ত্তা আমি নিজে আজ প্রাতে (২৮শে আগষ্ট) অনশনকারীদের জ্ঞাপন করিয়াছি। তাঁহারা অনশন ত্যাগ করিবার প্রশ্ন আলোচনা করিবার জন্য কিছু সময় চাহিয়াছেন এবং সন্ধ্যা ৭টা অবধি এই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। আগামী কাল আরও বিবরণ পাঠাইতে পারিব বলিয়া আশা করি।—আন্দামান।'

পরদিন প্রাতে ২৯শে আগষ্ট তারিখে চীফ কমিশনারের নিকট হইতে নিম্নলিখিত তার আসে :

'আমার ২৮শে তারিখে তারের পরে গত শেষ রাত্রে বেশীর ভাগ বন্দীই বিনাশর্ত্তে অনশন স্থগিত রাখিয়াছেন। কেবলমাত্র সাতজন এখনও অনশন করিতেছেন।—আন্দামান।'

সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ

ইহার উত্তরে আন্দামান-নিকোবরের চীফ কমিশনারের নিকট গান্ধীজীর ৩০শে আগষ্ট তারিখের তার :

'তারের জন্য ধন্যবাদ ; সাতজন ব্যতীত সকলেই অনশন ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। এই সাতজন অনশন চালাইবার জন্য কি কোনও কারণ দেখাইয়াছেন ? আমি তাঁহাদের অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের মুক্তির জন্য দেশবাসীকে সুযোগ দেন। বন্দীরা কি অহিংসা সম্বন্ধে আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর দিবেন না ?"

ইহার উত্তরে বড়লাটের দপ্তর হইতে গান্ধীজী ৩০শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৭টার সময় নিম্নলিখিত তার পান :

সিমলা, এফ ৫ নম্বর-জেল

আন্দামান রাজবন্দীরা আপনার বার্ত্তার উত্তরে নিম্নলিখিত তার পাঠাইয়াছেন :

"আপনার বাণী ও সমগ্র দেশবাসীর আবেদন আমাদের অভিভূত করিয়াছে। সমগ্র দেশ আমাদের দাবী মিটাইবার জন্য ভার গ্রহণ করিয়াছে—এই আশ্বাসে আমরা অনশন স্থগিত রাখিলাম। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, আপনি অচিরেই আমাদের দাবী পূরণ করাইতে সক্ষম হইবেন। আপনি সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে আমাদের অকপট মতামত ব্যক্ত করিবার যে সুযোগ দিয়াছেন তাহাতে আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম। আমরা আপনাকে এবং আপনার মারফৎ সমগ্র জাতিকে এই কথা জানাইতে সম্মানিত বোধ করিতেছি যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা কোনও দিন সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা আজ আর তাহা বিশ্বাস করেন না এবং রাজনৈতিক অস্ত্র বা মতবাদ হিসাবে ইহার ব্যর্থতা সম্বন্ধে তাহারা আজ দৃঢ়বিশ্বাসী।

আমরা মনে করি যে, সন্ত্রাসবাদ আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনকে শক্তিশালী না করিয়া খর্ব্ব করে।"

উপরোক্ত তারে সাক্ষর—"অনশনকারী ও ধর্ম্মঘটরত বন্দী।"

বন্দীরা গান্ধীজীকে তারযোগে অনশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ও সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে তাঁহাদের উপরে উক্ত মত একই সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বড়লাটের দপ্তর হইতে গান্ধীজীকে কেবলমাত্র এই খবরই পাঠান হয় যে বন্দীরা অনশন স্থগিত রাখিয়াছেন—কিন্তু ঐ সাথে বন্দীদের সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে মত চাপা দিয়া রাখা হয়। সাম্রাজ্যবাদী সরকার তখনই ইহা বুঝিয়াছিল যে, সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে বন্দীদের মত গান্ধীজীর নিকট পাঠাইলে তাহা দেশের জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং বন্দীদের লোকচক্ষে হেয় করার যে-ঘৃণ্য প্রচেষ্টা আমলাতন্ত্র বরাবর করিয়া আসিতেছে তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। পরে গান্ধীজী ৩০শে আগষ্ট তারিখে চীফ কমিশনারের কাছে এ সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে, আমলাতন্ত্র তখন সন্ত্রাসসবাদ সম্পর্কে বন্দীদের মতামত তাঁহার কাছে পাঠাইতে বাধ্য হয়।

বন্দীদের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ

১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী বাংলাদেশে আসেন। এখানে আসিয়া তিনি আন্দামান প্রত্যাগত একদল দীর্ঘমেয়াদী বন্দীদের সহিত দেখা করিয়াছিলেন এবং তখন হইতে বাংলা সরকারের সহিত এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা চালান। ঐ সময়ে কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে গান্ধীজী এই বিবৃতি দেন :

"কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আন্দামান বন্দীদের সাহায্যের জন্য আমার আন্তরিক চেষ্টার ফলাফল আমি জনসাধারণকে জানাইতে চাই।

"এই চেষ্টার ফলে এবং বাংলা সরকারের সদয় অনুমতিতে গত ৩০শে অক্টোবর আমি আন্দামান হইতে স্থানান্তরিত বন্দীদের সহিত দেখা করিবার সুযোগ পাই। আমি তাঁহাদের সহিত প্রায় দুই ঘণ্টা কাটাইয়াছিলাম।

"সরকারের সহিত আমি এ বিষয়ে পত্রালাপ করিতেছি। আশা করি যে, ১১ই তারিখে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিব। তখন গভর্ণরের সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা আছে এবং প্রয়োজন হইলে, অবশ্য যদি সরকারের অনুমতি পাই, তবে রাজবন্দী ও ডেটিনিউ উভয়ের সহিতই দেখা করিব।

"ইত্যবসরে আশা করি যে বন্দীরা, যেখানেই থাকুন, পুনরায় অনশন করিয়া অবস্থা কঠিন করিয়া তুলিবেন না। আমি খবর পাইয়াছি যে, অনেক বন্দী দেরী দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিতেছেন। আমি তাঁহাদের এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে আমার দিক দিয়া চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। তাঁহাদের সাহায্যের জন্য জনসাধারণের আন্দোলন যে কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই—একথাও তাঁহাদের জানা প্রয়োজন।"

সংবাদপত্রের বিবরণ

গান্ধীজী ও বাংলা গভর্ণরের প্রস্তাবিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে সংবাদপত্রে নানারকম বিবরণ প্রকাশিত হয়। এসোসিয়েটেড প্রেস বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয় যে, গান্ধীজী তাঁহার কলিকাতায় অবস্থান কালে বাংলার চারিজন মন্ত্রীর সহিত দেখা করিবার পর, গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনের সহিত বন্দীমুক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট খবর পাঠান।

উত্তরে গান্ধীজীকে জানানো হয় যে, গভর্ণর বাহাদুর নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ শেষ হইবার পূর্ব্বে কলিকাতায় ফিরিতে পারিবেন না, সুতরাং গান্ধীজী যদি তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহেন, তাহা হইলে শিলিগুড়িতে যাইয়া ৫ই নভেম্বর প্রাতে দেখা করিতে পারেন। যদি ইহা গান্ধীজীর পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ৯ই হইতে ২০শে নভেম্বরের মধ্যে কলিকাতায় প্রস্তাবিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

—এসোসিয়েটেড প্রেস

আন্দামান হইতে দেশের জেলে ফিরাইয়া আনার প্রস্তাব

গান্ধীজী প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ, কে, ফজলুল হকের নিকট এই মর্ম্মে একটি তার পাঠান যে আন্দামান-রাজবন্দীরা যখন নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করিয়াছেন তখন তাঁহাদের মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক।

বাংলার প্রধান মন্ত্রী উত্তরে যাহা বলেন তাহা জানা যায় নাই। তবে মনে হয় যে, প্রধানমন্ত্রী সরকারী প্রস্তাবের দিকে গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছেন। প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে বিভিন্ন দলের নেতাদের লইয়া আন্দামান রাজবন্দীদের ভারতে স্থানান্তরিত করিবার প্রশ্ন আলোচনা করিবার জন্য বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় ও পরিষদে একটি সম্মেলন ডাকা হইবে।

—ষ্টেট্‌সম্যান, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

গান্ধী-নাজিমুদ্দিন পত্রালাপ

গান্ধীজীর চিঠি

১২ই এপ্রিল, ১৯৩৮

প্রিয় স্যর নাজিমুদ্দিন,

আমাদের গতকালের কথোপকথন অনুসারে আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পাঠাইতেছি :

১। আমি শুনিয়াছি যে ডেটিনিউ এবং রেগুলেশন আইনের বন্দীদের আজ হইতে এক মাসের মধ্যে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং তাঁহাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার পথ

হইতে সকল বাধা অপসরণ করা হইবে। আশা করি এই ব্যাপারে আমাকে আর কলিকাতায় যাইতে হইবে না। যদি ওখানে আমার উপস্থিতির প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আমি আনন্দিত চিত্তে যখনই প্রয়োজন হইবে তখনই যাইব।

২। দণ্ডিত রাজবন্দী সম্বন্ধে আমি প্রস্তাব করিতেছি যে :—

(ক) অসুস্থ বন্দীদের কারাবাসের সময় উত্তীর্ণ হউক বা না হউক, তাঁহাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন।

(খ) যাঁহাদের কারাবাস উত্তীর্ণ হওয়ার আর মাত্র ৬ মাস বাকী আছে তাঁহাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক।

(গ) যাঁহাদের ১৮ মাসের কম কিন্তু ৬ মাসের বেশী দণ্ডভোগ বাকী আছে তাঁহাদের তিন মাসের মধ্যে মুক্তি দেওয়া হউক।

(ঘ) যাঁহাদের ১৮ মাসেরও বেশী বাকী আছে, তাঁহাদের অন্ততঃ এক বৎসরের মধ্যে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন।

৩। সরকার এবং অপর পক্ষের অর্থাৎ কংগ্রেস পার্টির মধ্যে নিম্নলিখিত চুক্তির উপর ঐ সকল মুক্তি নির্ভর করিবে :—

(ক) মুক্ত ডেটিনিউ বা রাজবন্দীদের সম্মানার্থে জনসাধারণের কোনরূপ শোভাযাত্রা ইত্যাদি হইবে না।

(খ) যে মীমাংসায় পৌঁছান যাইবে তাহা সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য কংগ্রেস পার্টির পক্ষ হইতে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে কোনোরূপ আন্দোলন করা হইবে না। অর্থাৎ বাংলাদেশে অন্তত রাজবন্দীর মুক্তির বিষয় লইয়া কোন রাজনৈতিক দল অথবা জনসাধারণ কোন প্রকার আন্দোলনের সৃষ্টি করিবে না।

এই প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে আমি ইচ্ছা করিয়াই কোনরূপ বাদানুবাদ হইতে বিরত রহিলাম। এই প্রস্তাবগুলির কথা আমি আপনার সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিয়াছি এবং আপনিও সে আলোচনা অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে শুনিয়াছেন।

আমার এই আলোচনা ও প্রস্তাবের ফল যাহাই হউক না কেন, আমাদের মধ্যে এই চুক্তি হইয়াছে যে কিছুদিনের মধ্যে, অর্থাৎ আজ হইতে একমাসের মধ্যে, বাংলা সরকার নিশ্চয়ই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

আপনি আমাকে বলিয়াছেন, ডেটিনিউ অথবা রাজবন্দীরা অহিংসা সম্বন্ধে যেকোনো প্রতিশ্রুতিই আমার নিকট দিন না কেন সরকারের সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পথে তাহার কোনো প্রভাব থাকিবে না। আপনি জানেন যে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের উপায় হিসাবে তাঁহাদের সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া আমি এই কার্য্যে হাত দিয়াছি। আমার নিজের তুষ্টির জন্য আমি তাঁহাদের সহিত এই প্রশ্ন আলোচনা করিয়াছি। এবং যদিও তাঁহারা শীঘ্র মুক্তিলাভের আশায় কোনো বিবৃতি দিতে চাহেন নাই তবু তাঁহারা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথ হিসাবে সন্ত্রাসবাদের উপর তাঁহাদের আর কোন আস্থা নাই। আমি তাঁহাদের এই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করি এবং এই সকল বন্দী মুক্তি না পাইলে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হইবে বলিয়া মনে করি।

গতকল্য আলোচনাকালে আমি একটি কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। দমদম জেলের বন্দীরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের প্রেরিত কতকগুলি পত্র আমি পাইয়াছি কিনা। পাইয়াছি বলিয়া তো আমার মনে হইতেছে না। কেবলমাত্র মেদিনীপুর জেলের মহিলা বন্দীদের নিকট হইতে কতকগুলি চিঠি পাইয়াছি। অতীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ভাবিয়া লাভ নাই—তবে ভবিষ্যতে আপনি দয়া করিয়া দেখিবেন তাঁহাদের চিঠিগুলি যেন পাই—অবশ্য যদি সেগুলি আপত্তিজনক না হয়। —গান্ধী

বাংলা সরকারের পরিকল্পনা

১১ই জুন, ১৯৩৮

প্রিয় গান্ধীজী,

সন্ত্রাসবাদী বন্দীদের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে মুক্তি দেওয়া সম্পর্কে বাংলা সরকারের সিদ্ধান্ত আপনাকে জানাইতেছি। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পূর্ব্বে সরকার আপনার ১২ই এপ্রিল তারিখের চিঠিতে প্রদত্ত প্রস্তাবগুলি সযত্নে আলোচনা করিয়াছে।

নিম্নে প্রদত্ত পরিকল্পনাটী যে একটী অখণ্ড পরিকল্পনা, একথাটী প্রারম্ভেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন। উহার প্রত্যেকটী অংশই অবিভাজ্য। আপনি পরিকল্পনাটী গ্রহণ করিবেন এই আশায় উহা আপনার নিকট পাঠাইতেছি। আশা করি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এবং ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেস দলের নেতারাও উহা গ্রহণ করিবেন। সরকারের ইচ্ছা, আপনি যেন এই পরিকল্পনাটী বিশদভাবে বিচার করেন। কারণ সরকারের এই নীতি সম্বন্ধে আপনার ও কংগ্রেসের অনুমোদন উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণের সর্ব্বপ্রধান শর্ত্ত। যদি আপনারা উহা অনুমোদন না করেন, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণভাবে বাতিল হইয়া যাইবে এবং সরকার ব্যবস্থাপক সভায় যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন সেই নীতি অনুযায়ী কার্য্য করিয়া যাইবে।

পরিকল্পনাটী নিম্নরূপ :—

(১) সরকার এখন হইতে কঠিন রোগাক্রান্ত ও ক্রমাগত পীড়িত সন্ত্রাসবাদী বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিবে।

(২) যাঁহাদের কারাদণ্ড শেষ হইতে ৬ মাস অথবা তাহার কম সময় অবশিষ্ট আছে তাঁহাদিগকে সরকার যতশীঘ্র সম্ভব মুক্তি দিবে।

(৩) কারাদণ্ড শেষ হইতে যাঁহাদের ৬ মাসের অধিক অথবা ১৮ মাসের কম সময় বাকী আছে সরকার তাঁহাদের ৩ মাসের মধ্যে মুক্তি দিবে। অবশ্য যাঁহারা প্রকৃত হত্যা অথবা ঐ ধরণের সাংঘাতিক অপরাধের অভিযোগে দণ্ডিত তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইবে।

(৪) বাংলায় সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস এবং জনসাধারণের উপর উহার প্রভাবের কথা চিন্তা করিয়া সরকার সন্ত্রাসবাদী বন্দীদের বিষয় বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের মুক্তি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে অক্ষম। এই ধরণের পরীক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেকটী বন্দীর বিষয় পৃথকভাবে বিচারযোগ্য। ইহার জন্য আমাদের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। বিষয়গুলি যথাক্রমে : বিচারের পর কতদিন কারাবাস হইয়াছে, অপরাধের গুরুত্ব, কোন শর্ত্ত অথবা কি শর্ত্ত মানিয়া লইলে মেয়াদের সময় হ্রাস বা মুক্তির কথা উঠিতে পারে। উপরোক্ত তিন দফায় যাঁহাদের কথা চিন্তা করা হইয়াছে তাঁহাদের ও অন্যান্য সমস্ত সন্ত্রাসবাদী

বন্দীদের বিষয় এ্যাড্‌ভাইসরি কমিটির নিকট পেশ করা হইবে। তাঁহারা প্রত্যেকের সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত সরকারের নিকট ব্যক্ত করিবেন। এই সকল মতামত গ্রহণ করা অথবা না করা সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপর নির্ভর করিবে।

(৫) এই এ্যাডভাইসরি কমিটিকে সরকার নিযুক্ত করিবে। এই কমিটিতে নয় জন সভ্য থাকিবেন।

পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এই শর্ত্ত মানিয়া লইয়া কাজ করিতে হইবে।···

কে, নাজিমুদ্দিন

পরিকল্পনাটী অসন্তোষজনক

১৫ই জুন, ১৯৩৮, বোম্বাই

প্রিয় খাজা সাহেব,

গতকল্য প্রাপ্ত আপনার ১১ই তারিখের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আমি আজ উহা সুভাষবাবুকে দেখাইয়াছি। উহা যে আমার আশা পূর্ণ করে নাই তাহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই প্রশ্ন আলোচনা করিতে সরকারকে যে পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করি। তাঁহাদের এই অত্যধিক সাবধানতাও প্রশংসনীয়। সেইজন্য আমি কোন দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যাইতেছি না। কিন্তু আপনার চিঠিতে যে নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে আমি জানিতে চাহি যে, প্রথম তিনটী শর্ত্ত কার্য্যকরী হইবার পর আরো কতজন বন্দীর মুক্তির কথা তখনও বিবেচনাধীন থাকিবে। কোনও সিদ্ধন্তে পৌঁছিবার পূর্বে রাজবন্দীরা সরকারের এই প্রস্তাব কিভাবে গ্রহণ করেন তাহা আমার জানা একান্ত প্রয়োজন। আপনার চিঠির ভাব দেখিয়া আমি ভালো-ভাবেই বুঝিতে পারিতেছি যে এই ধরণের কার্য্যপদ্ধতি মানিয়া লইতে আপনারা রাজী নহেন। কিন্তু আমি রাজবন্দীদের নিকট নৈতিক প্রতিশ্রুতির দ্বারা আবদ্ধ—সুতরাং পরিকল্পনাটী অব্যাহতরূপে কর্য্যকরী করিতে হইলে রাজবন্দীদের মনোভাব জানা আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সত্বর বিনা শর্ত্তে

মুক্তি ভিন্ন অন্য কোনও নীতি যদি আমি বিনা বাক্যব্যয়ে মানিয়া লই, তাহা হইলে আমি বিশ্বাসহন্তা রূপে পরিগণিত হইব। এই ব্যাপারে আপনি যে আমাকে কলিকাতায় যাইতে বলিবেন না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এবং সেইজন্যই আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে দয়া করিয়া সুভাষবাবু অথবা শরৎবাবুকে আমার প্রতিনিধি হিসাবে রাজবন্দীদের সহিত দেখা করিবার অনুমতি দিবেন।

বর্ত্তমানে ইহা গোপন রাখিবার জন্য আপনার অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা করা হইবে।

সুভাষবাবু এই চিঠি দেখেন নাই। তিনি কার্য্যকরী সমিতির সভা লইয়া অন্যত্র ব্যস্ত আছেন; তিনি যদি এখানে থাকিতেন তাহা হইলে আমার এই মতামত যে তিনি সমর্থন করিতেন এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

এম. কে. গান্ধী

সেবাগ্রাম, ওয়ার্দ্ধা
২৫শে জুন, ১৯৩৮

প্রিয় খাজাসাহেব,

আপনাদের ১৮ ই জুন তারিখের এবং বন্দীদের ২১ শে ও ২৬ শে তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ। বন্দীদের পত্রগুলি আমার নিকট আরও পূর্ব্বে আসিলে অনেক দিক দিয়াই ভালো হইত। ইহার সহিত আমি তাঁহাদের পত্রের উত্তর পাঠাইতেছি। আশা করি তাহা অবিলম্বে তাঁহাদের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইবে।

রাজবন্দী সম্পর্কে সুভাষবাবুর সহিত আমার বিস্তারিত আলোচনা করিবার সুযোগ হইয়াছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি আপনার সহিত দেখা করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা করেন এবং তখন প্রয়োজন বোধ করিলে আপনার নিকট হইতে বন্দীদের সহিত দেখা করিবার অনুমতি চাহিবেন। এই বিষয়ে তাঁহার ও শরৎবাবুর অনুমোদন সঙ্গতভাবেই প্রয়োজনীয়। এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে অন্যান্য আলোচনা তাঁহাদের মধ্যে একজনের সহিত হওয়াই শ্রেয়। তাহা ছাড়া,

এই ব্যবস্থা আমাকে পুনর্ব্বার বাংলাদেশে যাত্রা করার হাত হইতে অব্যাহতি দিবে। আপনাকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বর্ত্তমানে অতিরিক্ত কার্য্যের চাপে আমার শরীর আবার খারাপ হইয়াছে।

সরকারের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটী আমাদের তিনজনের দ্বারা গৃহীত হইবার পূর্ব্বে ইহা বলিয়া রাখা প্রয়োজন, উহা যেন আমার ১৩ই তারিখের পত্রে প্রস্তাবিত পকিরল্পনার সমতুল্য হয়। ইহা অপেক্ষা কম কিছু গ্রহণ করিলে আমি রাজবন্দীদের নিকট বিশ্বাসহন্তা রূপে পরিগণিত হইব। কেননা আমি তাঁহাদের একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে, তাঁহারা অহিংসাবাদ গ্রহণ করিলে আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের অবিলম্বে মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। সেইজন্যই যে পরিকল্পনা রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির কথা উল্লেখ করে না—সে ব্যবস্থার মধ্যে আমি কোনক্রমেই থাকিতে পারি না।......

আশা করি, আপনার সহিত সুভাষবাবুর দেখা হইলে কোনো একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব হইবে। যদি কোন সময় আমার উপস্থিতি প্রয়োজন বলিয়া বোধ করেন এবং আমার উপস্থিতি যদি এই ব্যাপারে সাহায্য করে, তাহা হইলে আমাকে একছত্র লিখিয়া জানাইতে ইতস্ততঃ করিবেন না। আমার শরীর ভালো থাকিলে আমি সানন্দে বাংলায় যাইব।

এম, কে, গান্ধী

*   *   *

বাংলা সরকারের দপ্তরখানা
কলিকাতা,
৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

প্রিয় গান্ধীজী,

আপনার শেষ চিঠি পাইবার পর আমি সন্ত্রাসবাদী বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন আলোচনা করিবার জন্য সুভাষবাবুর সহিত চারিবার দেখা করিয়াছি। চতুর্থ বারের অর্থাৎ ৩রা আগষ্ট তারিখের সাক্ষাৎটী তিনি দমদম ও আলিপুর জেল দেখিবার অনুমতি পাইবার পর ঘটিয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, সমস্ত

রাজ-বন্দীদের মুক্তির নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত না করিলে তিনি আপনার নিকট আমার ১১ই মে তারিখের পত্রে বর্ণিত পরিকল্পনা গ্রহণ অথবা এ বিষয়ে সরকারের সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত নহেন। প্রত্যেকটী রাজবন্দীর বিষয়ে সরকাকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগের সহিত ঐরূপ একটি নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারণের কোনও সঙ্গতি থাকে না। আমরা এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না।

সুতরাং এই সরকারী পরিকল্পনা আপনি গ্রহণ করিবেন কিনা তাহা আমাকে ১৯৩৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে জানাইলে বাধিত হইব। কেন না তাহা হইলে আমরা অবিলম্বে আমাদের নীতি ঘোষণা করিয়া উহা কার্য্যকরী করিতে অগ্রসর হইতে পারি।

যদি আপনার বিনা সম্মতিতেই আমাদের অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে আমাদের এই পত্রালাপ জনসধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত বলিয়া মনে করি এবং ইহার জন্য আমি আপনার অনুমতি চাহিতেছি।

কে, নাজিমুদ্দিন

সেবাগ্রাম, ওয়ার্দ্ধা
মধ্যপ্রদেশ
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় খাজাসাহেব,

রাজবন্দী সম্পর্কে আপনার ৮ই তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ জানিবেন। এই ব্যাপারে আপনি যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন কেবলমাত্র তাহারই জন্য আপনার প্রস্তাব গ্রহণের যতই ইচ্ছা থাকুক না কেন, উহা গ্রহণ করিলে আমার পক্ষে বিশ্বাসহন্তার কাজ করা হইবে। আপনি জানেন যে, এই বন্ধুদের নিকট আমি পবিত্র প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ আছি—কারণ আমারই কথায়

তাঁহারা অনশন স্থগিত রাখিয়াছেন। তাঁহাদের মুক্তির জন্য আমাকে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। এবিষয়ে আপনার সহিত একমত হইলে আমি তাঁহাদের মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারিব বলিয়া মনে করি না।

সময় নির্দ্দিষ্ট করিলেই ট্রাইবুনালের কাছে মতামত গ্রহণের কোন মূল্য থাকিবে না বলিয়া মনে করি না। কেন না ট্রাইবুনালের কাছে মতামত গ্রহণকালে এই বন্দীদের মুক্তির নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত করা আপনার পক্ষে অসঙ্গত হইবে না। মতামত গ্রহণের শর্ত্ত অনুযায়ী বিচারকেরা যদি মনে করেন যে কাহারও অপরাধ এমনই গুরুতর যে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে না তাহা হইলে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা করিতে পারেন। আমার এই আপত্তি অপনার নিকট যাহাই মনে হউক না কেন আমি নিজের উপর দোষারোপ হয় এমন কোন দায়িত্ব লইতে পারি না।

বাংলা সরকার ও তাহার পরামর্শদাতাগণ মুক্তিদানের প্রশ্ন আলোচনা করিবার সময় সম্ভবত সর্ব্বপ্রধান কথাটীই বাদ দিয়া গিয়াছেন। রাজবন্দীরা নিজেদের দোষী বলিয়া মনে করেন না। অপরাধগুলি যতই সাংঘাতিক হউক, সেগুলি ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য করা হয় নাই। রাজবন্দীরা বর্ত্তমানে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে মনোভাব বদলাইয়াছেন বলিয়াই এই অবরোধ তাঁহাদের নিকট অসহ্য কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে। জনসাধারণের সেবার জন্য তাঁহারা উৎসুক হইয়া আছেন। এবিষয়ে জনমতও সরকারী মত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। কিন্তু যেহেতু আপনাদের সরকারকে জনসাধারণের নিকট দায়িত্বসম্পন্ন সরকার বলিয়া গণ্য করা হয়, সেহেতু আপনারা জনমত মানিয়া চলিতে বাধ্য। এবং বিচার করিলে দেখা যায় যে, জনমত আজ জোরগলায় তাঁহাদের মুক্তি দাবী করে।

যদিও আমি স্বাকার করি যে, আপনি যথার্থভাবে বন্দীদের ও জনসাধারণের শান্তিরক্ষার জন্য আমার ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করিবার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছেন—তবু আমার মনে হয় যে এই উপায়ে বরং শান্তি নষ্ট হইতে পারে। যাহা হউক এই বিষয়ে আমি বেশী কিছু বলিতে চাহি না।

আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি, সরকার উপরোক্ত বিষয়ে যে ব্যবস্থা করিতে চাহেন তাহার সহিত সহযোগিতা করিতে আমি অক্ষম। তাহার

কারণসমূহ আমি আমার পূর্ব্বলিখিত পত্র ও আলোচনার মধ্য দিয়া জানাইয়াছি। এই বিষয়ে আমার প্রতিনিধি হিসাবে সুভাষবাবুও আপনাকে জানাইয়াছেন। কিন্তু ইহার মানেই যে আমি আপনাদের বন্দী-মুক্তি-প্রয়াসে বাধা দিব, এমন নহে। আপনারা কত শীঘ্র বন্দীদের মুক্ত করিতেছেন তাহারই উপর আমার ভবিষ্যত কার্য্যাবলী নির্ভর করিবে। আমার ১৯৩৮ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখের পত্রই এই বিষয়ের মাপকাঠি।

আমাকে বন্দীদের সহিত দেখা করিবার ও তাঁহাদের সহিত পত্রালাপের যে সুযোগ আজ পর্য্যন্ত দিয়াছেন, আশা করি ভবিষ্যতে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

আমাদের মধ্যে যে পত্রালাপ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে দিতে আমার কোনই আপত্তি নাই। আশা করি, এই প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝিয়া সকলেই ইহাকে নিজেদের রাজনৈতিক দলগত স্বার্থের বাহিরে রাখিবে। আমি ইহাও আশা করি, জনসাধারণ ও সংবাদপত্রগুলি এমন কিছু করিবে না বা লিখিবে না যাহা বন্দীদের অবিলম্বে-মুক্তির জন্য আন্দোলনকে কোনরূপ হিংসার পথে চালিত করে।

এম, কে, গান্ধী

বন্দীদের নিকট গান্ধীজীর চিঠি

আলিপুর জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের নিকট ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে গান্ধীজী যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ :

—অনশন করা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়। যদিও কোন কোন অবস্থায় অনশন সমর্থনীয়, তবুও মুক্তিলাভের জন্য বা অন্যায়াচরণের প্রতিকার নিমিত্ত অনশন করা ভুল,—বিশেষ করিয়া আমি যখন কথাবার্ত্তা চালাইতেছি তখন আপনাদের এই পথ অবলম্বন করার ফলে আমার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হইবে। অনশন না করিয়াও যখন আপনারা আমার সাহায্য পাইতেছেন তখন অনশনের কথা চিন্তা করিবার কারণ কি? আমার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি হয়ত বেশী দিন বাঁচিব না, হয়ত এক বৎসর বা তাহার কিছু অধিক বাঁচিব। আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, এই সময়ের

অধিকাংশই আমি আপনাদের মুক্তি সাধনের চেষ্টায় নিয়োজিত করিব। আমি মৃত্যুর পূর্ব্বেই আপনাদের মুক্ত দেখিতে চাই। আমি আপনাদের আজ এই কথাই দিতেছি এবং আমি চাই যে আপনারাও এই কথা দিন যে, যতদিন আমি আপনাদের মুক্তি-সাধনের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিব, ততদিন আপনারা অনশন করিবেন না।

যতদিন আমি আপনাদের মুক্ত করিতে না পারি ততদিন আমি শান্তি বা আরাম পাইব না। আমার কথা আপনাদের বিশ্বাস করিতে হইবে। বিশ্বাস আছে বলিয়াই মানুষ বাঁচে। এইস্থলে আমি আইনব্যবসায়ীর কার্য্য করিতেছি না। একজন লোক হিতৈষী ও অহিংসা উপাসকের কার্য্য করিতেছি। যতক্ষণ আপনারা বন্দীশালায় আবদ্ধ থাকিবেন ততক্ষণ অহিংসা প্রসারতা লাভ করিবে না। এবং সেইজন্য এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি জীবন পণ করিয়াছি। সুতরাং অনশনের কথা আর চিন্তা করিবেন না।"

বলা বাহুল্য, বন্দীরা গান্ধীজীকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, তাঁহার চেষ্টার ফলাফল না দেখিয়া তাঁহারা অনশন ধর্ম্মঘট করিবেন না। (এ-পি)

জাতীয় কংগ্রেসের প্রচেষ্টা

১৯৩৯ সালের মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কলিকাতা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই অধিবেশন বাংলা দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি-সাধনের জন্য মহাত্মা গান্ধীর অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। সেই সঙ্গে এই বিষয়ে তাঁহার ও হক্ মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে আলোচনা বিফল হওয়াতে দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। যে সময়ের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি আশা করিয়াছিলেন তাহা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাংলা মন্ত্রীমণ্ডলীর এই নির্ম্মম ও নিস্পৃহ মনোভাব এবং তাহাদের গৃহীত নীতির জন্য দীর্ঘকাল দণ্ডিত রাজবন্দীদের মুক্তির আশা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

রাজবন্দীরা এক বিশেষ সময়ে বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং যখন ইহারা প্রকাশ্যভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, সন্ত্রাসবাদের উপর তাঁহাদের কোন আস্থা নাই তখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মনে করে তাঁহাদের আটকাইয়া রাখার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। সেই জন্যই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি স্থির করিয়াছে যে, বাংলা ও পাঞ্জাবের রাজবন্দীদের মুক্তি আন্দোলনকে সারা ভারতের আন্দোলনে পরিণত করিবে এবং সেই আন্দোলনের পথ নির্দেশ করিবার জন্য এই কমিটি ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরোধ করিতেছে।

তদানীন্তন কংগ্রেস-সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিবৃতি

পাটনা, ১০ই মে, ১৯৩৯

গত দুই বৎসরের মধ্যে বিচারে অথবা বিনা বিচারে আবদ্ধ বহু সংখ্যক রাজবন্দী মুক্তি পাইয়াছেন। কিন্তু এখনও বিশেষতঃ বাংলায় ও পাঞ্জাবে বহুসংখ্যক রাজবন্দী কারারুদ্ধ আছেন। বাংলার রাজবন্দী ও ডেটিনিউগণ সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস ত্যাগের ঘোষণা করায় মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদের মুক্তি-সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে সকল বন্দীরা মুক্তি পান নাই তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘদিনব্যাপী আলাপ-আলোচনা বিফল হইল। যদিও কখন কখন বন্দীরা মুক্তি পাইতেছেন, তবু বাংলা দেশের বহুসংখ্যক এবং পাঞ্জাবের কয়েকজন দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক বন্দী এখনও জেলে আবদ্ধ আছেন।

বন্দীরা যখন সন্ত্রাসবাদে তাঁহাদের আস্থা ত্যাগের কথা ঘোষণা করিলেন তখনই তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল। যাঁহারা মুক্তি পাইয়াছেন তাঁহারা সন্ত্রাসবাদী কার্য্যে যোগদানের কোনোরূপ ইচ্ছা দেখান নাই এবং তাঁহারা তাঁহাদের আচরণের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, যাহা তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন তাহা সত্য ও অকৃত্রিম। কিন্তু কি কারণে জানি না, সরকার দীর্ঘমেয়াদী বন্দীদের সম্বন্ধেও মুক্ত রাজবন্দীদের মত ব্যবহার করা হউক দেশের জনসাধারণের এই ইচ্ছার নিকট নত হইতে রাজী নহে। সমগ্র দেশে যে রাজবন্দীদের স্বপক্ষে ব্যাপক সহানুভূতি দেখা দিয়াছে একথা বিশেষভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কলিকাতা অধিবেশন রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ

করিয়া সেই ব্যাপক সহানুভূতিকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সেই প্রস্তাব অনুসারে আমি ২১শে মে রবিবার "রাজনৈতিক বন্দী-দিবস" হিসাবে পালন করিবার জন্য ঘোষণা করিতেছি।

ঐ দিন সভাসমিতি করা হইবে এবং এই বিষয়ে উপযুক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে। আমি বিশ্বাস করি যে, সমগ্র দেশে ঐ দিবস উপযুক্ত ভাবে পালন করা হইবে।

পুনরায় অনশন ও গান্ধীজীর বিবৃতি

আলিপুর ও দমদম জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসের অনশন সম্বন্ধে গান্ধীজীর বিবৃতি :

আবোটাবাদ, ১৫ই জুলাই ১৯৩৯

"......যদিও আমি পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি যে রাজবন্দীরা অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া ভুল করিয়াছেন কিন্তু তবু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি বাংলা সরকারকে রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়া এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটাইতে অনুরোধ করিব। অনেক পূর্ব্বেই তাঁহাদের মুক্তি পাওয়া উচিত ছিল। যথার্থভাবে হউক বা ভুল করিয়াই হউক জনসাধারণ আশা করিয়াছিল যে, দায়িত্ব সম্পন্ন আইনসভার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজবন্দীরা মুক্ত হইবেন এবং আমি মনে করি যে জনসাধারণের এই ধারণা অন্যায় নয়। বহুদিন পূর্ব্বেই সেই আশা পূরণ হওয়া উচিত ছিল। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবীর ন্যায় যুক্তিসঙ্গত দাবীর নিকট অবনত হইলে সরকারের কোন অসম্মান তো হইতই না বরঞ্চ লাভ হইত।"

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব

১৯৩৯ সালের ৯ই আগষ্ট

"দমদম ও আলিপুর জেলের অনশনব্রতী রাজাবন্দীরা দুই মাসের জন্য অনশন স্থগিত রাখায় ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কার্য্যকরী সমিতি আশা করে যে, বাংলা সরকারও রাজাবন্দীদের এই প্রশংসনীয় সংযমের যোগ্য মর্য্যাদা দিবে। বাংলা সরকারের নিকট ওয়ার্কিং কমিটির আবেদন এই যে, রাজনৈতিক

বন্দীদের সত্বর ও বিনা শর্ত্তে মুক্তির জন্য সারা ভারতব্যাপী যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে বাংলা সরকার তাহার সম্মান রক্ষা করিবে।

"পাঞ্জাব ও বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই কমিটির আবেদন, তাহারাও যেন নিজ নিজ এলাকার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের ব্যবস্থা করে। কারণ এই সব বন্দী আর সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নহেন।"

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রের কমিটির প্রস্তাব

১৯৩৯ সালের ৩০শে অক্টোবর

"এই প্রদেশের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের জন্য জনসাধারণের দাবীর উত্তরে বাংলা সরকারের বিবৃতি পাঠ করিয়া এই সভা হতাশ ও মর্ম্মাহত হইয়াছে। ইহা দেশব্যাপী বিক্ষোভের সৃষ্টি করিবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন কার্য্যকরী হইবার পর আড়াই বৎসর চলিয়াছে—কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীরা এখনও কারারুদ্ধ আছেন। এই ঘটনা প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে কলঙ্কের বিষয়। পূর্ব্বেকার প্রস্তাব অনুসারে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি-সাধনের জন্য এই সভা সব কিছু করিতেই অঙ্গীকৃত আছে। এমন কি প্রয়োজন হইলে সত্যাগ্রহ করিতেও প্রস্তুত।

"বর্ত্তমানে যুদ্ধের দরুণ দেশে সংকট উপস্থিত হওয়াতে অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কংগ্রেসকে এখন একদিকে যুদ্ধ সমস্যা ও অপরদিকে স্বাধীনতা অর্জ্জন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সেই জন্য আজ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সমস্যা অন্য তুইটী বৃহত্তর সমস্যার অংশ হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসকে আজ এই সমস্যাগুলির সমাধান করিতে হইবে। এই সভা মনে করে যে, একটীর সমাধান সঙ্গে সঙ্গে অপরটীর সমাধান আনিয়া দিবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এই বৃহৎ সমস্যাগুলি সফলতার সহিত সমাধান করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

"এই সমস্যাগুলির বিষয়ে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁহার বামপন্থী সহযোগীদের মতামত এই সভা আন্তরিকভাবে অনুমোদন করে এবং মনে করে যে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ তাঁহাদের মতামত ন্যায্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে।"

বিপ্লবী বন্দীদের চিঠি

সংগ্রামরত বিপ্লবী চীনের সাহায্যে আন্দামান বন্দীরা

সেলুলার জেলে আবদ্ধ বন্দীরা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের চীফ্ কমিশনারের নিকট নিম্নলিখিত পত্র পাঠান :

মহাশয়,

আমরা আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দীরা সংলগ্ন পত্রখানি টেলিগ্রাফ মারফৎ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নিকট পাঠাইতে চাই। সেই সঙ্গে জেনারেল চু-তের মর্ম্মস্পর্শী আবেদনের উত্তরে আমাদের যৎসামান্য সঞ্চয়ও চীনের সাহায্যার্থে পাঠাইতে চাই। আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস যে আপনি উপরোক্ত অনুরোধগুলি দয়া করিয়া অনুমোদন করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। ইতি—

রাজনৈতিক বন্দীবৃন্দ

পণ্ডিতজীর নিকট বন্দীদের পত্র

সেলুলার জেল, পোর্টব্লেয়ার

মাননীয় পণ্ডিতজী, ১৪।১।৩৮

সেন্সর পরীক্ষিত সংবাদপত্র মারফৎ আমরা যে সামান্য খবরাখবর পাইয়াছি তাহাতে এই বিশ্বাস আমাদের দৃঢ়তর হইয়াছে যে, ফ্যাশিষ্ট শক্তির উত্থান আজ সমগ্র পৃথিবীকে যুদ্ধের অসীম ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়া এক অন্ধকারময় গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছে। এইরূপ ধ্বংসলীলা যে পৃথিবীতে আর কখনও দেখা যায় নাই—তাহা আমরা এই সুদূর দ্বীপের বন্দীশালায় আবদ্ধ থাকিয়াও সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও সভ্যতা এই তিনটী কথার সহিত পরোক্ষভাবেও জড়িত সব কিছুর উচ্ছেদ করিয়া ইতিহাসকে শত শত বৎসর পিছাইয়া দেওয়া এবং সেই-সঙ্গে সমগ্র মানব জাতিকে দাসত্বের চরম শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়া মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন এই রক্তপিপাসু ফ্যাশিষ্ট কুকুরদের তৃষ্ণা মিটিবে না।

সমগ্র মানবজাতির জীবন-মৃত্যুর সমস্যা আজ ফ্যাশিজমের জয় বা পরাজয়েরই উপর নির্ভর করিতেছে।

কেলগ চুক্তি অবহেলা করিয়া চীনের নিরাপত্তার উপর অহেতুক নিষ্ঠুর আক্রমণ ও মাঞ্চুরিয়া দখলের পর দেখা গেল আবিসিনিয়ার উপর ইটালীর নির্লজ্জ আক্রমণ। সমগ্র পৃথিবীর গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের অসহায় দৃষ্টির সম্মুখে স্পেনীয় গণতন্ত্র আজ জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত।

আমাদের প্রাচীনতম বন্ধু ও নিকটতম প্রতিবেশী চীন আজ তার জাতীয় জীবন ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে জাপানী অক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। সমগ্র মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপ আজ আসন্ন বিপদের সম্মুখীন। পৃথিবীর মানচিত্র হইতে তাহাদের সকল চিহ্ন মুছিয়া যাইবার সম্ভাবনা আজ প্রবল।

অগণিত ভারতবাসীর ভাগ্যও ঠিক এমনি ভাবেই বিপর্য্যস্ত বলিয়া অনুভব করিতেছি। এই সর্ব্বগ্রাসী সঙ্ঘবদ্ধ বর্ব্বরতা আমাদেরও ঠিক এমনি ভাবেই নির্ম্মূল করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে।

জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপান এই ফ্যাশিষ্ট শক্তিত্রয় যখন দিনে দিনে ক্রমশই সাহসী ও সর্ব্বগ্রাসী হইয়া উঠিতেছিল তখন সর্ব্বত্র গণতন্ত্রের বন্ধুবৃন্দ অসহায়ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, নিস্ক্রিয় ছিল। ফ্যাশিষ্ট দস্যুদের এতখানি স্পর্দ্ধার মূলে ছিল অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য। এসব দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি তাহাদের শাসকশ্রেণীকে এই সকল কার্য্য হইতে বিরত করিবার মত শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে নাই বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

সম্প্রতি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির নিকট চীনের অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি চু-তের সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের জন্য মর্ম্মস্পর্শী আবেদন আসিয়াছে। সে-আবেদন বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের অধিকতর সচেতন করিয়া দিয়াছে।

ঠিক তাঁহারই মত ইহার তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া আমরা তাঁহার এই আবেদন সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আপনার ও সমগ্র জাতির প্রতি আমাদের একান্ত অনুরোধ যে আপনারা অবিলম্বে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির ভার গ্রহণ করুন। বর্ত্তমান অবস্থা পৃথিবীর প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী ও গণতন্ত্ররক্ষাকারী নরনারীর নিকট হইতে এই সকল কার্য্যে সাহায্য দাবী করে।

কাজটি হইতেছে, অবিলম্বে সমস্ত দেশব্যাপী ফ্যাশিজম ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগঠন গড়িয়া তোলা। এই সকল সংগঠনগুলি নিখিল বিশ্ব ফ্যাশিজম সঙ্ঘের সহিত একযোগে কার্য্য করিবে।

যে আদর্শের জন্য স্পেন ও চীন আজ সংগ্রাম করিতেছে তাহা জনসাধারণের নিকট প্রচার করা, সাহায্যের জন্য যথাসম্ভব জিনিষপত্র সংগ্রহ করা ও পাঠাইবার ব্যবস্থা করা, জাপানী দ্রব্য বর্জ্জনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, নাবিক ও ডক মজুরদের মধ্যে প্রচারকার্য্য দ্বারা জাপান ও স্পেনের ফ্যাশিষ্টদের নিকট কোন প্রকার যুদ্ধ সামগ্রী পাঠানো বন্ধ করা—কেবলমাত্র এই সকল উপায় দ্বারাই আমরা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে এই উপলব্ধি সৃষ্টি করাইতে পারি যে, চীন এবং স্পেনের জনগণের সংগ্রাম আজ আমাদেরই সংগ্রাম।

একমাত্র এইভাবেই আমরা আমাদের দেশবাসীদেরও অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারি।

এমনি দিন আমাদের সম্মুখেও আসিবে, কাজেই তাহাকে রোধ করিবার আয়োজনে সামান্য বিলম্বও পরোক্ষভাবে তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিবে না কি?

এইভাবে প্রস্তুত দেশগুলি ফ্যাশিষ্ট দস্যুবৃত্তি রোধ করিতে সক্ষম তো হইবেই, সেই সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও প্রগতির পথও উন্মুক্ত করিয়া দিবে।

আমরা আপনাকে ও দেশবাসীদের জানাইতে চাহি যে, তাঁহাদের প্রচেষ্টার সহিত আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য সংযোজিত করিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছি।

জেনারেল চু-তের আবেদনের উত্তরে আমরা ভারতবাসীরা যাহাতে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পারি তাহারই ব্যবস্থা করুন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

—রাজনৈতিক বন্দীবৃন্দ

আলিপুরের বন্দীদের চিঠি

১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের তরফ হইতে গঠিত নিখিল ভারত চীন-সাহায্য-ভাণ্ডারে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক বন্দীরা ৫৭৲ টাকা ও দমদম

জেলের বন্দীরা ১৬০৲ টাকা পাঠাইয়াছিলেন। ঐ সম্পর্কে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতির নিকট আলীপুর জেলের দীর্ঘমেয়াদী বন্দীদের জুলাই মাসে লিখিত পত্রটি এই :

"আমরা বন্দীশালায় আবদ্ধ থাকিয়াও চীনের সংগ্রামরত বীরদের জন্য আপনার উৎকণ্ঠা সম্যক উপলব্ধি করিতেছি। কেননা রক্তপিপাসু ফ্যাশিষ্ট শক্তির অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র উৎপীড়িত মানব জাতির প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহারাই যে আজ রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এ কথা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। যদিও আমাদের বেশী কিছু দিবার সামর্থ্য নাই, তবুও আমরা আমাদের প্রিয়তম চীনা ভাইদের এই মহান্ সংগ্রামে তাঁহাদের সহিত আমাদের জীবন্ত যোগাযোগ ও অবিনশ্বর ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ এই সামান্য ৫৭৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া আপনার নিকট পাঠাইতেছি।

"এই সুযোগে আপনাকে ও কংগ্রেসকে আমরা অনুরোধ জানাইতেছি যে, বর্ব্বর ফ্যাশিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে স্পেনের জনসাধারণের এই জীবন মরণ সংগ্রামে তাঁহাদের সাহায্যের জন্যও ঠিক এই রকম একটী ফাণ্ড গঠন করা হউক।"

দেশবাসীর কাছে বন্দীদের আবেদন

রাজনৈতিক মামলায় দণ্ডিত ২৪ জন বন্দী ১৯৪২ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে কারা-প্রাচীরের মধ্য হইতে দেশবাসীকে আবেদন জানাইয়া যে বিবৃতি দিয়াছিলেন নিম্নে তাহা দেওয়া হইল :

আমাদের ভ্রাতা ও ভগিনীগণ!

মানব ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে সারা পৃথিবী যখন এক অভূতপূর্ব্ব সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, যখন সমগ্র মানব জাতির ভাগ্য এক অনিশ্চয়তায় দোদুল্যমান, তখন আমরা ভারতমাতার প্রত্যেকটি মহৎ সন্তানের কাছে আমাদের এই আবেদন পাঠাইতেছি। আমাদের আশা, তাঁহারা তাঁহাদের কারারুদ্ধ ভাইদের এই আবেদন সহানুভূতি ও আন্তরিকতা লইয়া বিবেচনা করিবেন।

বিশাল হিংস্রতায় অতুলনীয় পৃথিবীব্যাপী এই যুদ্ধ সমস্ত জাতি ও জনসাধারণের ভাগ্য নির্ণয় করিতে চলিয়াছে; এই বিরাট সংঘর্ষের ফলাফলের উপর ভারতীয় জনসাধারণের ভবিষ্যৎ যে একান্তভাবে নির্ভর করিতেছে, তাহা আজ আমাদের মানিয়া লওয়া প্রয়োজন। যে-কোন দেশের যে-কোন রাজনৈতিক সমস্যাকে যুদ্ধের এই চরম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিবেচনা করিতে গেলে তাহা বর্ত্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতির পটভূমিকায় অর্থহীন ও তাৎপর্য্যহীন হইবে। তাই বিশ্ব-সঙ্কটের বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে সবচেয়ে বড় যে-প্রশ্ন আমাদের নিজেদের কাছে জিজ্ঞাসা করা উচিত তাহা এই: ফ্যাশিজমের জয় বা পরাজয় ভারতবাসীর স্বার্থকে কি ভাবে প্রভাবিত করিবে? ইংলণ্ড, সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, আমেরিকা ও অন্যান্য জাতির সম্মিলিত জনসাধারণের জয় বা পরাজয় ভারতবাসীর অগ্রগতিকে কিভাবে সাহায্য করিবে বা বাধা দিবে? বর্ত্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির মূল বিষয়গুলি উপলব্ধি করিলে এই প্রশ্ন হইতেই ইহার উত্তর স্পষ্ট হইয়া যায়। এই বিশ্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে ফ্যাশিস্টদের পর পর বহু জয়লাভের ফলে এবং উহার পরিণতি হইয়াছে সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর নাৎসী আক্রমণে। জার্ম্মেনীর এই আক্রমণ এক রাষ্ট্রের প্রতি অন্য রাষ্ট্রের বিশ্বাসঘাতকতার চরম নিদর্শনরূপে ইতিহাসে চিরদিন উল্লিখিত হইবে।

বৃহত্তম সম্মিলিত ফ্রণ্ট

আন্তর্জ্জাতিক শক্তিসমূহ যেভাবে পক্ষ গ্রহণ করিয়াছে তাহা হইতে এই মূল বিষয়টাই পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠে যে, সমস্ত জাতির যে-সব কীর্ত্তি সমগ্র প্রগতিশীল মানুষের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে ফ্যাশিস্ট রাষ্ট্রপুঞ্জ ঠিক সেই সব কীর্ত্তিই ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর। স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে চীন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সম্মিলনে বিশ্বব্যাপী সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির ব্যাপকতম ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্টই সৃষ্টি হইয়াছে। জনসাধারণের এই বিশ্বব্যাপী ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে রহিয়াছে ফ্যাশিজমের সম্মিলিত শক্তি, যাহা মানব সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত ও মহান্ কীর্ত্তিকে উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প।

আমাদের মতে বর্ত্তমান বিশ্বপরিস্থিতির এই মূল সত্যটির উপরেই আমাদের লক্ষ্য ও নীতি ঠিক করা উচিত। অতএব, একমাত্র যদি স্বাধীনতা ও প্রগতির বিশ্বশক্তি বাঁচিয়া থাকে ও পুষ্টিলাভ করে তাহা হইলেই-যে ভারতীয় জাতির স্বাধীনতা অর্জ্জন করা ও টি঳কাইয়া রাখা সম্ভব—এই সত্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে কি ? আজ যখন নাৎসী ফ্যাশিস্ট দস্যুরা ঠিক এই শক্তিগুলিকেই নিশ্চিহ্ন করিবার উপক্রম করিয়াছে, যখন ফ্যাশিস্ট দাসত্বের আশংকা দেখা দিতেছে —যে দাসত্ব অতীতের যে-কোন দাসত্ব অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক নিষ্ঠুর, সেই সময়ে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে ফ্যাশিজ্‌মের পরাজয় ভারতীয় জাতির প্রগতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক। যদি বিজয়ী ফ্যাশিজমের পদতলে স্বাধীন ও প্রগতিশীল জনসাধারণের বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট চূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা যায় কি ? মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম কীর্ত্তির প্রতীক সোভিয়েট ইউনিয়নের গৌরবান্বিত জনসাধারণ যদি নাৎসী যান্ত্রিক বাহিনীর শক্তির তলে ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলে কোথায় থাকিবে ভারতের স্বাধীনতা ? ফ্যাশিস্ট আক্রমণের মর্ম্মঘাতী আঘাতে মহাচীনের শৌর্য্যবান জনসাধারণ যদি প্রাণ হারায় তাহা হইলে কোথায় থাকিবে ভারতের স্বাধীনতা ? ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য জাতির স্বাধীনতাপ্রিয় জনসাধারণের ভাগ্য যদি পরাজয় ও দাসত্বে অভিশাপগ্রস্ত হয় তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতার কি হইবে ?

বৃহত্তর সংগ্রাম

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ফ্যাশিস্ট পদানত পৃথিবীতে প্রকৃত মুক্ত ও স্বাধীন ভারতবর্ষের কল্পনা মরীচিকা মাত্র। বর্ত্তমান বাস্তব পরিস্থিতিতে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন ফ্যাশিজমের জয় বা পরাজয়ের সহিত সম্পর্কহীন একটা নিরপেক্ষ বিষয় হইতে পারে না। পক্ষান্তরে পৃথিবীর প্রগতিশীল জনসাধারণ আন্তর্জ্জাতিকভাবে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যে বৃহত্তর সংগ্রাম চালাইতেছে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস তাহা হইতে অবিচ্ছেদ ও অবিভাজ্য। ফ্যাশিস্ট শক্তির জয় লাভ হইলে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা যে কত দিনের জন্য পিছাইয়া যাইবে তাহা কে জানে ?

প্রগতিশীল শক্তি বনাম ফ্যাশিজম্

এ কথা কি বলা যায় যে, ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন ও আমেরিকার ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণের জয়ে মানবজাতি এবং ভারতবাসীর পক্ষে ঐরূপ সর্ব্বনাশ দেখা দিবে ? নিশ্চয়ই না। আজ ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ চালানো হইতেছে তাহা আর শুধু রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সাধারণ যুদ্ধ নয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিরাট মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই এই যুদ্ধ প্রথমতঃ ও মূলতঃ মানব ইতিহাসের বৃহত্তম মুক্তির যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রগতিশীল জাতিসমূহের ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্টে যোগদান ছাড়া বৃটিশ শাসকবর্গের পক্ষে আর অন্য কোন পন্থা ইতিহাস রাখে নাই ; এবং জনসাধারণ এই যুদ্ধে স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করায় গণ-উদ্যম এত বাড়িয়া যাইবে যে এই জনযুদ্ধ পরিপূর্ণ রূপ লাভ করিবে। ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে মিত্র শক্তির জয় হইবে এবং এই বিজয় সারা পৃথিবীতে মুক্তি ও প্রগতির শক্তি আরো দৃঢ় করিয়া তুলিবে। উপরের ঘটনা দুইটিই ইহার নিশ্চিত গ্যারাণ্টি।

জঘন্যতম মানব-দাসত্ব

আজ নাৎসী-ফ্যাশিস্ট একনায়কত্বের শাসন মানব দাসত্ব ও সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের জঘন্যতম প্রতীক। ফ্যাশিজ্‌মের পরাজয় হইলে এমন এক নূতন যুগের উদয় হইবে যেখানে মানব-দাসত্বের ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের প্রথা আন্তর্জ্জাতিকভাবে ভয়ানক দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এই কারণে আমরা মনে করি যে, ফ্যাশিজ্‌মের পূর্ণ পরাজয়-সাধনে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের রাজনৈতিক কর্ত্তব্য। এই কারণে আমরা ফ্যাশিস্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের জয়কে ত্বরান্বিত করিবার কল্পে অন্য সব কিছুকে উৎসর্গ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছি না। এই কারণে আজ "আমাদের স্বার্থ সর্ব্বাগ্রে" এই ধ্বনি না তুলিয়া "অন্যদের" স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা আমাদের কর্ত্তব্য মনে করিতেছি, কারণ বর্ত্তমান বাস্তব পরিস্থিতিতে ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যকে অগ্রসর করিবার এবং ভারতীয় জাতির চরম স্বার্থ সিদ্ধি করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে—যে-সকল স্বাধীন জাতি আজ নিজেদের জীবন ও অস্তিত্বের জন্য লড়াই করিয়া সেই সঙ্গে স্বাধীন ও শ্রেষ্ঠতর জগৎ সৃষ্টির জন্য লড়াই করিতেছে তাহাদের জয়কে নিশ্চিত করা। সে জগতে সাম্রাজ্যবাদ ও অন্য জাতির উপর উৎপীড়ন করিবার শক্তির ভিত্তি সম্পূর্ণ টলিয়া শিথিল হইয়া যাইবে।

মানবতার প্রতি দায়িত্ব

এ কথা আমরা ভুলিয়া যাই নাই যে, যুদ্ধ যাহাতে সত্যই ফ্যাশিজ্‌মের উপর জনসাধারণের জয়লাভের ভিতর দিয়া অবসান হইতে পারে, তজ্জন্য জনসাধারণকে তাহাদের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে হইবে। ভারতে বৃটিশ নীতির অতি প্রত্যক্ষ ত্রুটি বিচ্যুতির কথাও আমরা ভুলিয়া যাই নাই। আমরা ভুলিয়া যাই নাই যে, গণতন্ত্রের যে মূল নীতির জন্য বৃটেন, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের জনগণ তাহাদের রক্ত ঢালিয়া দিতেছে এদেশে বৃটিশ শাসকগণ তাহা প্রয়োগ করেন নাই। আমাদের দেশের শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের মনে যে বিক্ষোভ আজ বিদ্যমান, এই বিচ্যুতি ও ব্যর্থতাই যে তাহার কারণ একথাও আমাদের মনে আছে। কিন্তু ক্ষুব্ধ অসন্তোষে মানুষ যে পথ বাছিয়া লয় সেই পথই যে প্রকৃষ্ট পথ তাহার কোন অর্থ নাই। আমলাতান্ত্রিক নিপীড়নের প্রত্যক্ষ লক্ষ্যবস্তু আমরা,—ক্ষমতাধিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তোষ আমাদেরই থাকিতে পারে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তথাপি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা স্মরণ করিয়া, আমরা যে আদর্শের ধ্যান করিয়া আসিয়াছি তাহার কথা স্মরণ করিয়া এবং সমগ্র অগ্রগামী মানব সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ অসন্তোষে আমরা ফ্যাশিজ্‌ম-বিরোধী বিশ্বজনগণের এই বিশাল সংগ্রাম সম্পর্কে উদাসীন থাকিয়া বা বিরোধিতার নীতি অবলম্বন করিয়া ফ্যাশিস্ট শত্রুদের হাতে ক্রীড়া-পুত্তলিকা হইতে পারি না। আমরা আবার বলিতেছি যে, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন জনগণের ভাগ্য আজ এক সূত্রে এমনভাবে গ্রথিত যে বিজয়ী ফ্যাশিজ্‌মের পদানত পৃথিবীতে ভারতীয় জনগণের কোন স্বতন্ত্র ভবিষ্যৎ থাকিতে পারে না। অতএব, আমরা দেশের সকল গণপ্রতিষ্ঠানের নিকট এই আবেদন জানাইতেছি যেন তাহারা বর্ত্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির এই মূল ঘটনাগুলি গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া তাহাদের নীতি পরিবর্ত্তিত করে।

আমাদের আবেদন

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নিকট আমরা আবেদন জানাইতেছি, মানব ইতিহাসের এই অভূতপূর্ব্ব সঙ্কট মুহূর্ত্তে তাঁহারা যেন ফ্যাশিজ্‌ম-বিরোধী বিরাট আন্দোলনের পথে ভারতীয় জনগণকে পরিচালিত করিয়া ফ্যাশিষ্ট শত্রুদের উপর জনসাধারণের জয়লাভের দিন আসন্ন করিয়া তুলেন। এই মহান প্রতিষ্ঠানের নিকট আমরা আবেদন জানাইতেছি, তাঁহারা যেন বৃটিশ শাসক শ্রেণীর মনোভাবের

উপর নির্ভর করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ না করেন, ভারতীয় জনগণের পুরোধা হিসাবে তাঁহারা যেন ইতিহাসের আহ্বানে সাড়া দেন। ভারতীয় ইতিহাসের বর্ত্তমান চরম মুহূর্ত্তে ইহাই দুরূহতম দায়িত্ব। ভারতের জাতীয়-কংগ্রেস ভারতীয় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। জনসাধারণের এই সর্ব্বস্বপণ সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস যদি প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে, তবে ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী শক্তি-সম্মেলন যে কেবলমাত্র অপরিমেয় ক্ষমতা সঞ্চয় করিতে পারিবে তাহা নহে, জনগণের জয়লাভ ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দিনও আসন্ন হইয়া উঠিবে।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও শ্রমিক ভাইদের নিকট আমরা এই আবেদন জানাইতেছি: তাঁহারা যেন ফ্যাশিজ্মের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী এই শক্তি-শালী গণসম্মেলনে উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লন। বহু বৎসরের প্রাণপাত শ্রমিক আন্দোলনের ফলে শ্রমিকশ্রেণী যে সকল মহামূল্য সম্পদ লাভ করিয়াছেন তাহা আজ ফ্যাশিস্ট দস্যুদের হাতে নির্ম্মূলভাবে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে; বিজয়ী সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েট ইউনিয়ন, আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর মহত্তম আশা আকাঙ্ক্ষা যেখানে পূর্ণ মহিমার রূপ গ্রহণ করিয়াছে সেই দেশের উপর আজ সংহার ও সর্ব্বনাশের করালছায়া নামিয়াছে। পরম শৌর্য্যবান লালফৌজ ও সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ আজ জগতের সম্মুখে অভূতপূর্ব্ব বীরত্ব ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত রাখিতেছেন; তাই আজ ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র কর্ত্তব্য ফ্যাশিজ্মের বিরুদ্ধে সর্ব্বস্বপণ সংগ্রামে বীর যোদ্ধারূপে যোগদান করা।

ছাত্র ও কৃষক ভাইদের প্রতি

প্রিয় ছাত্র-সহকর্ম্মী ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট আমরা এই আবেদন জানাইতেছি, তাঁহারা যেন মনে রাখেন ফ্যাশিষ্ট গুণ্ডার দল যদি আজ এই অন্যায় যুদ্ধে জয়লাভ করে তবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সকল সম্পদ একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। ফ্যাশিজ্ম জয়ী হইলে তাহার পরিণাম কি হইবে তাহা বুঝাইবার জন্য এই সুদূরপ্রসারী সঙ্কটের দিনে আমাদের ছাত্রকর্ম্মীগণকে জনসাধারণের যুক্তি ও বুদ্ধি জাগ্রত করিতে হইবে। এই জাগ্রত চেতনা সহজেই ফ্যাশিজ্মের বিরুদ্ধে শক্তিশালী গণ-আন্দোলনে পরিণত হইতে পারে। দ্বিধাদৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া পাটনা সিদ্ধান্তে তাঁহারা যে নির্ভুল পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন তজ্জন্য আমরা এই সুযোগে

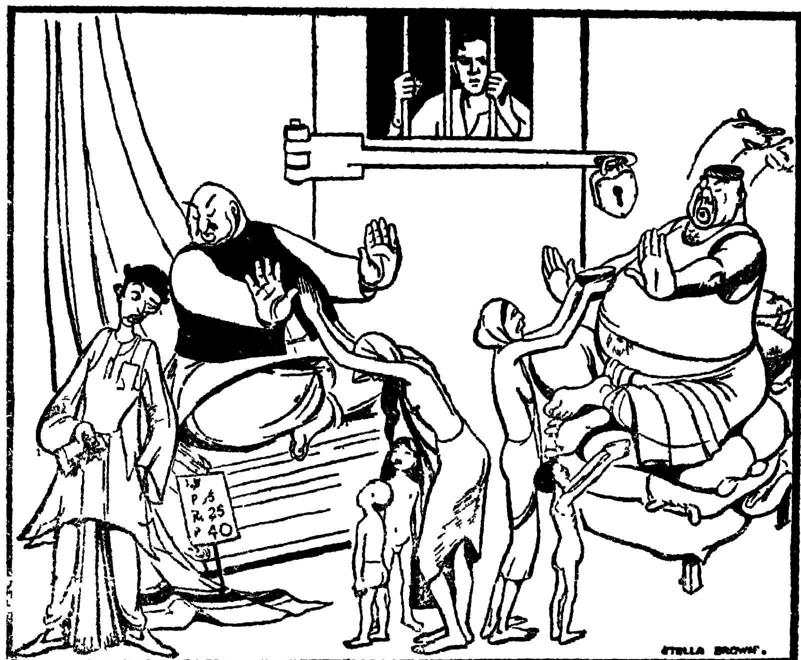
নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। যে আদর্শের জন্ত ফ্যাশিস্ট-বিরোধী জনগণ ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, সেই আদর্শে সম্মিলিত হইবার জন্ত আহ্বান জানাইয়া তাঁহারা নিজেদের স্বাধীনতা, প্রগতি ও সংস্কৃতির বাহক হিসাবে প্রমাণ করিয়াছেন।

নিখিল ভারত কৃষক সভা ও কৃষক ভাইদের নিকট আমাদের আবেদন, তাঁহারাও যেন ফ্যাশিস্ট-বিরোধী এই গণ-আন্দোলনে যোগদান করেন। ভারতের অন্তান্ত শ্রেণীর মত কৃষক সম্প্রদায়ের ভাগ্য বর্তমান সংগ্রামের ফলাফলের উপর নির্ভর করে। ফ্যাশিজমের জয় যে কেবল সকল স্বাধীন জাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিতে বাধ্য করিবে তাহা নয়—শ্রমিক ও কৃষকদের একমাত্র রাষ্ট্র, যাহা তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, তাহাও ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতএব এ যুদ্ধে তাহাদের দায়িত্ব আশু ও প্রত্যক্ষ। ফ্যাশিস্ট কবলিত দেশগুলিতে দেখা গিয়াছে যে, ফ্যাশিস্টদের জয়ে কৃষক শ্রেণীর অবস্থা হইবে গৃহপালিত পশু ও ক্রীতদাসের মত। আমাদের দেশের শ্রমিক জনসাধারণের কল্যাণ যাহারা কামনা করেন তাঁহাদের এই নিষ্ঠুর সত্যটি ভুলিলে চলিবে না।

বিশ্বমানবতার আহ্বান

অতএব ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, আসুন সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করিয়া বিশ্বমানবের আহ্বানে সাড়া দেই। আসুন, সম্মান ও সঙ্কল্পের সহিত আমরা আমাদের আসন্ন কর্তব্য পালন করি। ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে জনসাধারণ যোগদান না করিলে চরম সর্বনাশ ও অনন্ত দাসত্বের ভয়াবহ অভিশাপ আমাদের চিরদিন বহন করিতে হইবে। ইতিহাস আমাদের পক্ষে, জয়লাভ আমাদের সুনিশ্চিত। যে নূতন যুগ আসিতেছে তাহাতে দাসত্ব ও নির্য্যাতনের অভিশাপ হইতে মানুষ মুক্ত হইবে। ভারতের জনগণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে এতদূর অগ্রসর হইয়া যাইবে যাহা অতীতে আর কখনও সম্ভবপর হয় নাই।

আপনাদের—গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, প্রভাত চক্রবর্ত্তী, শচীন কর-গুপ্ত, হরিপদ দে, আনন্দ গুপ্ত, প্রিয়দা চক্রবর্ত্তী, পূর্ণেন্দু গুহ, সুখেন্দু দস্তিদার, সুবোধ চৌধুরী, হরিপদ ভট্টাচার্য্য, কামাখ্যা ঘোষ, নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বিরাজ মোহন দেব, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, সহায়রাম দাস, সুকুমার সেনগুপ্ত, বিনয়ভূষণ রায়, মোক্ষদা চক্রবর্ত্তী, নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, কালীপদ চক্রবর্ত্তী, মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য, অমূল্য রায়।



[শিল্পী : স্টেলা ব্রাউন]

অম্বিকা চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বন্দীদের আহ্বান

বাংলার ভাইবোনদের প্রতি

সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫

জাপ ফ্যাশিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের আত্মসমর্পণের সাথে সাথে ইতিহাসের সবচেয়ে প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধের অবসান হ'ল। এক যুদ্ধোত্তর নতুন যুগের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে আমরা উপস্থিত। সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য পঁচিশ বছরের মধ্যে দুই-দুইটি মহাযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে, তার অবসান ঘটিয়ে দুনিয়ার বুকে শান্তি, স্বাধীনতা আর সমৃদ্ধির দিন আনার জন্য বিশ্বমানবের বিরাট সমাবেশ গ'ড়ে উঠছে—এই হ'ল এ-যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ।

অন্য যে-কোনো দেশের তুলনায় ভারতের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সমস্যা অনেক বেশী জটিল। আমলাতন্ত্রের তো কারো কাছে জবাবদিহি করবার দায় নেই; দেশের লোকের অভাব-অভিযোগ ও মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র তার শাসনযন্ত্র পরিচালনা ক'রে চলেছে। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে হাজার হাজার দেশভক্ত কারারুদ্ধ; শিল্প-বিস্তারের পথ অবরুদ্ধ; স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সকল প্রকার জাতিগঠনমূলক কার্য্যকলাপ অবদমিত। এই কারণেই যুদ্ধোত্তর যুগের শিল্প-বাণিজ্যে মন্দা, বেকার সমস্যা, মজুরী হ্রাস প্রভৃতি প্রশ্ন ভারতবাসীকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলেছে।

এই সব কয়টি সমস্যাই সবচেয়ে জটিল ও তীব্র আকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বাংলা দেশে। যুদ্ধক্ষেত্রের নিকবর্ত্তী ব'লে বাংলাকে যুদ্ধের চাপ সহ্য করতে হয়েছে সবচেয়ে বেশী। বাংলারই ৩০ লক্ষ নরনারী দুর্ভিক্ষে জীবন দিয়েছে। জনস্বার্থবিরোধী ৯৩ তন্ত্রের আমলে দুর্নীতিপরায়ণ আমলা আর সমাজবিরোধী মজুতদারই শক্তিশালী হয়েছে, আর তারই ফলে দেশের মানুষ তার সমাজ-বোধ প্রায় হারিয়ে ফেলেছে।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আমরা সামান্য কয়টি সংবাদপত্র থেকে টুক্‌রো টুক্‌রো যতটুকু সংবাদ পেয়ে থাকি তারই সাহায্যে এ-কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বাংলার সমাজ-জীবনের পুনর্গঠনের কাজ শুধু কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। গবর্ণমেণ্ট বা কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক সংগঠন কারো তরফ থেকে দেশবাসীর দুঃখ মোচনের জন্য ঐকান্তিক উদ্যম দেখা যাচ্ছে না। সম্প্রতি অজন্মা ও বন্যায় দেশবাসীর সে-দুঃখ আরো দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশের মানুষ ক্ষুধায় ব্যাধিতে পথের ধারে জীবন পাত করছে, আমাদের মা বোন এক টুক্‌রো কাপড়ের অভাবে আত্মহত্যা করছে, রুগ্ন শিশুরা এক ফোঁটা দুধ না পেয়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। ছাত্রেরা না খেয়ে স্কুলে যায়, শিক্ষকেরা উপযুক্ত মাহিনা না পেয়ে শিক্ষকতা ত্যাগ করছেন, ছাত্র বা শিক্ষক কেউই বই-খাতা কাগজ-পত্র পাচ্ছেন না। চাষী-মজুরের নিরানন্দ নিরালোক ঘরে ঘরে আজ ক্ষুধিত শীর্ণ পঙ্গু সন্তানের জটলা। এমনই ভয়াবহ আজ বাংলার দুঃস্থতার ছবি। দেশবন্ধুর মত সহস্র দেশপ্রেমিকের অপরিমেয় স্বার্থত্যাগের ফলে আমাদের স্বদেশপ্রেমের যে বিরাট ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার ভিত্তি ছিল এই যে, গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষাকে অগ্রাহ্য ক'রে দেশবাসীর বিপদে-আপদে আমরা তাদের সেবা ক'রে গেছি। দেশের গণ-প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে আজ আমাদের প্রশ্ন: দেশবাসীর সেবায় অসঙ্কোচে আত্মনিয়োগ করে সেই ঐতিহ্যকে কি আপনারা বহন ক'রে চলেছেন?

যখন যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের বিপুল কর্ত্তব্যভারের কথা চিন্তা ক'রে দেখি আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা মনে আসে তখন নৈরাশ্যভারে মন অভিভূত হয়ে পড়ে। সমস্ত বাংলার জনশক্তিকে যদি জাগ্রত ক'রে না তোলা যায় তাহলে বাংলার পুনর্গঠন কখনো সম্ভব হবে না। ৯৩ তন্ত্র কখনো এ-কাজ সম্পন্ন করতে পারবে না, কারণ জনগণের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

আবার, কোনো একটি মাত্র গণ-প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও দেশের সমগ্র জনতাকে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব নয়। অথচ দেখি, কংগ্রেস ও লীগ পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ ও বিসংবাদে বাংলার রাজনৈতিক জীবন আজ বিষিয়ে উঠেছে। দেশভক্ত প্রতিষ্ঠান-গুলির পরস্পরের মধ্যে এই যদি সম্পর্ক হয়, তবে জাতীয় জীবনকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব বহন করবে কে? যে-বাংলার জন্য কারাদুঃখ বরণ করেছি, আজ যখন সেই বাংলার এই ছবি দেখি, তখন দীর্ঘ কারাজীবনের যন্ত্রণা শতগুণে দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে। সেই যন্ত্রণা আজ প্রকাশের ভাষা চায়, তাই আজ দেশবাসীর কাছে আমরা মুখ খুলেছি।

বাংলার সমাজকে আজ নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে, বাঙালী মজুর, চাষী, মধ্যবিত্তের পারিবারিক জীবনকে রক্ষা করতে হবে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনব্যাপী সাধনায় সমৃদ্ধ বাঙালীর গৌরবময় সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-কলার ধারাকে প্রবহমান রাখতে হবে। এই পবিত্র কর্ত্তব্যের সম্মুখে দলগত বিবাদ লুপ্ত হোক, সমস্ত সংকীর্ণতা, অন্ধতা, সন্দেহ-সংশয় নিঃশেষ হোক, বাঙালী তার নিজের ভাগ্যকল্পনার দায়িত্ব তার নিজের হাতে তুলে নিক।

সে-দায়িত্ব পালন করতে হলে প্রথম প্রয়োজন: অবিলম্বে বিনা শর্ত্তে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, সমস্ত দমনমূলক আইন প্রত্যাহার। তার ফলে, দেশের মধ্যে পুনরায় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক জীবন ফিরে আসবে, যাঁরা দেশের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন সেই সকল কর্ম্মীদের নেতৃত্বে জনসাধারণ পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠবে। জাপ ফ্যাশিস্টদের পরাজয়ের পর এই সকল বন্দীদের আর এক মুহূর্ত্তও আটক ক'রে রাখার পক্ষে কোনো সঙ্গত যুক্তি নেই, কোনো নৈতিক সমর্থন নেই।

যুদ্ধের অবসানে বেকার সমস্যাজনিত অসংখ্য রকমের কষ্ট বাঙালী মজুর, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনকে দুঃসহ ক'রে তুলবে। দেশের আর্থিক জীবনে এই ভয়াবহ বিপর্য্যয় যাতে আদৌ না ঘটে, তারই ব্যবস্থা করা হ'ল দেশবাসীর সম্মুখে দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণই সে-কর্ত্তব্যের ভার গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন হ'ল জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক জাতীয় সরকার। একমাত্র সেইরূপ জাতীয় সরকারই যুদ্ধোত্তর যুগের পুনর্গঠনের বিপুল কর্ম্মভার বহন করতে সক্ষম হবে। একমাত্র সেইরূপ সরকারই জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ-প্রয়োজনের পরিপূরণ করতে পারবে। কিন্তু দেশের সমস্ত গণ-প্রতিষ্ঠানের ঐক্যের ভিত্তিতেই সেই জাতীয় সরকার আমরা আদায় করতে পারি, নচেৎ নয়।

দেশের প্রতি মমতায়, দেশবাসীর দুঃখমোচনের মিলিত প্রয়াসে সমস্ত বিদ্বেষ সকল সন্দেহ পুড়ে ছাই হোক। আমাদের স্বদেশপ্রেমের শিখা আবার বহ্নিমান হয়ে উঠুক। কারান্তরাল থেকে সমস্ত দেশভক্তদের কাছে, সকল সংগঠনের কাছে, প্রত্যেকটি কমিউনিস্টের কাছে বন্দী সহকর্মীদের বিনীত নিবেদন—নতুন বাংলা গড়ার স্বপ্ন আপনাদের একই কর্ম্মক্ষেত্রে সমবেত করুক। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের আবেদন ব্যর্থ হবে না।

বাংলার দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক বন্দীদের তালিকা (১-১০-৪৫)

এখনো যাঁহারা কারাগারে আবদ্ধ তাঁহাদের নাম	দণ্ডকাল	কে কতদিন জেল খাটিয়াছেন
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা—(চট্টগ্রাম)		
অম্বিকা চক্রবর্ত্তী	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১৫ বৎসর
অনন্ত সিংহ	ঐ	১৬ "
গণেশ ঘোষ	ঐ	১৬ "
লোকনাথ বল	ঐ	১৬ "
সহায়রাম দাস	ঐ	১৬ "
লালমোহন সেন	ঐ	১৬ "
সুবোধ চৌধুরী	ঐ	১৬ "
সুখেন্দু দস্তিদার	ঐ	১৬ "
চাঁদপুর পুলিস সাব-ইনস্পেক্টর হত্যা মামলা—(ত্রিপুরা)		
কালী চক্রবর্ত্তী	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১৮ বৎসর
আশানুল্লা হত্যা মামলা—(চট্টগ্রাম)		
হরিপদ ভট্টাচার্য্য	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১৭ বৎসর

নাম	দণ্ডকাল	কে কতদিন জেল খাটিয়াছেন

ওয়াটসন হত্যা-প্রচেষ্টা মামলা—(কলিকাতা)

নাম	দণ্ডকাল	কে কতদিন জেল খাটিয়াছেন
সুনীল চট্টোপাধ্যায়	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১৫ বৎসর

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট গুলী চালনা মামলা—(কলিকাতা)

নাম	দণ্ডকাল	কে কতদিন জেল খাটিয়াছেন
নলিনী দাস	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১৪ বৎসর
জগদানন্দ মুখার্জ্জী	ঐ	১৪ "

গ্র্যাস্‌বী হত্যা প্রচেষ্টা মামলা—(ঢাকা)

নাম	দণ্ডকাল	কে কতদিন জেল খাটিয়াছেন
বিনয় রায়	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১৫ বৎসর

বার্জ্জ হত্যা মামলা—(মেদিনীপুর)

নাম	দণ্ডকাল	কে কতদিন জেল খাটিয়াছেন
শান্তি সেনগুপ্ত	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১৩ বৎসর
সুকুমার সেনগুপ্ত	ঐ	১৩ "
কামাখ্যা ঘোষ	ঐ	১৩ "

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা—(কলিকাতা)

নাম	দণ্ডকাল	কে কতদিন জেল খাটিয়াছেন
প্রভাত চক্রবর্ত্তী	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১২ বৎসর
পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত	ঐ	১০ "
সীতানাথ দে	ঐ	১০ "
জিতেন গুপ্ত	ঐ	১২ "
নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১৪ বৎসর	পূর্ণ দণ্ডভোগের পরেও গত ৩ বৎসর নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আটক আছেন।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা—(২৪পরগণা)

নাম	দণ্ডকাল	কে কতদিন জেল খাটিয়াছেন
প্রফুল্ল সেন	১৪ বৎসর	১১ বৎসর

হিলি ষড়যন্ত্র মামলা—(দিনাজপুর)

নাম	দণ্ডকাল	কে কতদিন জেল খাটিয়াছেন
হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১৩ বৎসর
প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী	ঐ	১৩

চরমুগরিয়া ডাক-লুঠের মামলা—(ফরিদপুর)

নাম	দণ্ডকাল	কে কতদিন জেল খাটিয়াছেন
সুরেন কর	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১৬ বৎসর

নাম	দণ্ডকাল	কে কতদিন জেল খাটিয়াছেন
আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট মামলা—(কলিকাতা)		
সুরেশ দাস	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১৬ বৎসর
কুমিল্লা গুপ্তচর হত্যার ষড়যন্ত্র ও ইটাখোলা ট্রেণ-লুঠ মামলা		
বিরাজ দেব	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১৫ বৎসর
ঢাকা গুপ্তচর হত্যা মামলা		
অমূল্য রায়	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১৪ বৎসর
ফরিদপুর গোয়েন্দা পুলিশ হত্যা মামলা		
আশু ভরদ্বাজ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১১ বৎসর
অমূল্য চৌধুরী	ঐ	৯ "
দিনাজপুর ষড়যন্ত্র মামলা		
নরেন ঘোষ	১৫ বৎসর	১৪ বৎসর
দীনেশ দাস	১২ "	পূর্ণ দণ্ডভোগের পরেও গত ১॥০ বৎসর নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আটক আছেন।
গভর্ণর হত্যা মামলা—(লেবং-দার্জ্জিলিং)		
মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জী	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১৩ বৎসর
মধু ব্যানার্জ্জী	১০ বৎসর	পূর্ণ দণ্ডভোগের পরেও গত ৩ বৎসর নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আটক আছেন।
সুকুমার ঘোষ	১০ "	ঐ (পূর্ববৎ)
দাসপুর দারোগা হত্যা মামলা—(মেদিনীপুর)		
কানন গোস্বামী	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১৭ বৎসর
শীতল ভট্টাচার্য্য	ঐ	১৭ "
ভূতনাথ মান্না	ঐ	১৭ "
বিনোদ বেরা	ঐ	১৭ "

নাম	দণ্ডকাল	কে কতদিন জেল খাটিয়াছেন
রংপুর ষড়যন্ত্র মামলা		
হেম বক্সী	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১৫ বৎসর
বাথুয়া ষড়যন্ত্র মামলা—(চট্টগ্রাম)		
মোক্ষদা চক্রবর্ত্তী	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১৩॥০ বৎসর
প্রিয়দা চক্রবর্ত্তী	ঐ	১৩॥০ "
চট্টগ্রাম গুপ্তচর হত্যা প্রচেষ্টা মামলা		
অমূল্য আচার্য্য	১০ বৎসর	৯॥০ বৎসর
বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন ভঙ্গের মামলা—(চট্টগ্রাম)		
বিনোদ দত্ত	৭ বৎসর	৪॥০ বৎসর
মেছুয়াবাজার বোমার মামলা—(কলিকাতা)		
শচীন করগুপ্ত	১৫ বৎসর	পূর্ণ দণ্ডভোগের পরেও গত ২ বৎসর নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আটক আছেন।

ভ্রম-সংশোধন

ছাপার ভুলে এই অংশটুকু ৬৪ পৃষ্ঠার শেষে বাদ পড়িয়াছে। পড়ার সময় সংশোধন করিয়া লইবেন।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা—(কলিকাতা)

নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

ময়মনসিংহ জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী হিসাবে ইনি খ্যাত ছিলেন। তিনি ১৯৩৩ সালে অস্ত্র-আইন ও ষড়যন্ত্র প্রভৃতিতে ৭ বৎসর এবং ১৯৩৫ সালে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় ৭ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া পরে আন্দামানে প্রেরিত হন। ইনি জেলে কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ণ দণ্ড ভোগান্তে মুক্তির পরে পুনরায় জেলগেটে সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে গ্রেপ্তার হইয়া তিনি ঢাকা জেলে আটক আছেন।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামালায় দণ্ডিত যে-সব মেয়াদী বন্দী পূর্ণ দণ্ডভোগের পরেও আবার সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে আটক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নরেন্দ্র ঘোষ ভিন্ন অন্য সকলেই মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহাকে এখনও মুক্তি দেওয়া হয় নাই।

৮৩ পৃষ্ঠার শেষের দিকে "মোহিত মৈত্র" স্থলে "মোহিত অধিকারী" ছাপা হইয়াছে। এই ভুলটী সংশোধন করিয়া লইবেন।

